ক্রুসেড-১৪
তুমুল লড়াই
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ১৪

তুমুল লড়াই

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

ক্রুসেড - ১৪

তুমুল লড়াই

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২

প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-14
Tumul Lorai
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by
Asad bin Hafiz

Published by
Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: May 2002

PRICE : ৫০.০০

ISBN 984-581-206-1

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

আফগানিস্তান থেকে আবার শুরু হয়েছে আধুনিক ক্রুসেড। কিন্তু এ ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

৬ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ৬ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ৬ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ৬ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ৬ ভয়াল রজনী ৬ আবারো সংঘাত ৬ দুর্গ পতন ৬ ফেরাউনের গুপ্তধন ৬ উপকূলে সংঘর্ষ ৬ সর্প কেল্লার খুনী ৬ চারদিকে চক্রান্ত ৬ গোপন বিদ্রোহী ৬ পাপের ফল

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৫

উমরু দরবেশ

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু

চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ- **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের চারটি বই

আতংকিত নানকিং
সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত
ব্ল্যাক আর্মির কবলে
হাইনান দ্বীপে অভিযান

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

অশান্ত চীন সাগর

হলব, হারান ও মুশালের সেনাবাহিনী মার্চ করে রণাঙ্গণে ছুটে আসছিল। এদিকে সুলতান আইয়ুবীর পক্ষে কায়রো থেকে যে সাহায্য আসার কথা, তাও যে কোন সময় এসে পৌঁছে যেতে পারে। শত্রুদের আক্রমণ আগে হয়, নাকি মিশর থেকে সৈন্য সাহায্য আগে এসে পৌঁছে, এটাই এখন দেখার বিষয়। এ নিয়েই অধীর ছিলেন সুলতান। কারণ তিনি বুঝঁতে পারছিলেন, কায়রোর সাহায্য ছাড়া শত্রুর এ তুমুল অভিযান ঠেকানো যাবে না। কিন্তু সাহায্য আসার আগেই যদি আক্রমণ এসে যায়, তাহলে! এ নিয়েই চরম উৎকণ্ঠা ও পেরেশানীতে ভুগছিলেন তিনি। সময় কাটাচ্ছিলেন নানা রকম চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনায়। বুদ্ধির শেষ শক্তিটুকুও ব্যয় করছিলেন এ কাজে। যদি সাহায্য আসার আগেই শত্রু আক্রমণ করে বসে, তবে এ সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কেমন করে যুদ্ধ চালাবেন তার অসম্ভবসব পরিকল্পনা শোনাচ্ছিলেন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের। তাদের নির্দেশ দিয়ে বলছিলেন, 'কমাণ্ডো বাহিনীকে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত ও সদা সতর্ক রাখো। কখন সাহায্য এসে পৌঁছবে জানা নেই আমাদের, কিন্তু এদিকে আক্রমণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। কমাণ্ডো বাহিনী দিয়েই তাদের আক্রমণ ঠেকাতে হবে।'

সুলতানের পেরেশানী দেখে এক সেনাপতি বললেন, 'আল্লাহর যা মঞ্জুর তাই হবে। এটা তো দুর্গ নয় যে, আমরা অবরোধের মধ্যে পড়ে যাবো। আমরা পাহাড়ের টিলা ও উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করবো, যেন দুশমন সহসা আমাদের দুর্বলতা টের না পায়।'

অধিকাংশ সেনাপতি এবং কমাণ্ডোরাও এ নিয়েই ভাবছিলেন। বাইরে প্রকাশ না করলেও ভেতরে ভেতরে সবার মাঝেই বিরাজ করছিল টান টান উত্তেজনা।

সন্ধ্যার লালিমা মুছে গেল। পাহাড়ের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাবুগুলো ঢেকে গেল রাতের আঁধারে। দেখতে দেখতে রাত গভীর হলো। মুজাহিদরা শুয়ে পড়লো যে যার তাবুতে। যাদের ডিউটি ছিল তাবু পাহারার, তারা চলে গেল ডিউটিতে। কিন্তু অস্থিরতা ও পেরেশানীর কারণে কেউ ভালমত ঘুমাতে পারলো না। সেনাপতিদের তাঁবুর মধ্যে রাতভর প্রদীপ জ্বলতে থাকল। না ঘুমিয়ে যুদ্ধের নকশা এঁকে চললেন তাঁরা। সুলতানের তাবুতেও প্রদীপ জ্বলছিল। তিনি ময়দান ও সেই পার্বত্য এলাকার নকশা আঁকলেন, যেখানে মনে মনে মোকাবেলা করবেন বলে ঠিক করেছেন।

রোজার সেহরী খাওয়ার জন্য নাকারা বেজে উঠলো। সৈন্যরা দ্রুত গিয়ে শামিল হলো দস্তরখানে। সুলতানও এসে ওদের সাথে যোগ দিলেন। ঠিক সে সময় দু'জন সংবাদবাহক দু'দিক থেকে এসে পৌঁছলো সুলতানের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি

খবরই তিনি এক সাথে পেয়ে গেলেন।
প্রথম কাসেদ জানালো, 'কায়রোর সৈন্য সাহায্য এসে গেছে। আজ ভোরেই আপনি ওদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে পারবেন।'
দ্বিতীয় কাসেদ বললো, 'শত্রু সৈন্য রণাঙ্গণ থেকে মাত্র আট-দশ মাইল দূরে এসে অবস্থান নিয়েছে। সম্ভবত: আগামী কাল ওরা আমাদের ওপর চড়াও হবে।'
সুলতান তার গোয়েন্দা বিভাগের কাছে জানতে চাইলেন শত্রুর সর্বশেষ গতিবিধির খবর। গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশীল কমাণ্ডার শত্রুর গতিবিধির বর্ণনা দিতে গিয়ে বললো, 'শত্রুরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক দল সামনে, দ্বিতীয় দল নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মাঝখানে রয়েছে, তৃতীয় দল অনেক পেছনে থেকে অনুসরণ করছে তাদের।'
সুলতান আইয়ুবীর যা জানার দরকার ছিল, তা জেনে গেছেন। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের কমাণ্ডারকে বললেন, 'তুমি গিয়ে কমাণ্ডো দলের কমাণ্ডার ও কায়রো থেকে আসা সেনাদলের হাইকমাণ্ডকে জলদি ডেকে আনো। তাদের বলবে, আমি তাদেরকে আমার সাথেই সেহরী খাবার দাওয়াত দিয়েছি।'
গোয়েন্দা বিভাগের কমাণ্ডার বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। উপস্থিত সৈন্যরাও হাত তুলল, তাঁর সাথে। মোনাজাত শেষ করে তিনি বললেন, 'তোমরা খাওয়া শুরু করো, আমি ওদের সাথে পরে বসবো।'

তিনি নিজের তাবুতে ফিরে গেলেন এবং ওরা এসে পৌঁছার আগেই দু'রাকাত নফল নামাজ সেরে নিলেন। নামাজ শেষে তিনি আবার আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছেন, এ সময় কমাণ্ডো দলের কমাণ্ডার এসে পৌঁছলো। তার একটু পরেই কায়রো থেকে আসা বাহিনীর সালার এসে ঢুকল তাবুতে।

সেহরীর সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল, সুলতান মেহমানদের সামনে সেহরীর খাবার পরিবেশন করার হুকুম দিলেন। খেতে খেতেই ওদের সাথে আলাপ শুরু করলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। প্রশ্ন করলেন, 'কায়রো থেকে কত সৈন্য নিয়ে এসছো?'

সালার সৈন্যের পরিমান অবহিত করলো সুলতানকে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সাহায্য সেনার পরিমাণ কমই ছিল, কিন্তু তাতে মোটেও বিচলিত হলেন না সুলতান। সংকট মুহূর্তে এটাকেই তিনি আল্লাহর রহমত মনে করলেন। বললেন, 'আর অস্ত্রশস্ত্র?'

কায়রো থেকে আনা অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ শুনে সুলতানের মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমান ছোট-বড় মিনজানিক কামান, আর সেই সাথে গোলা বারুদও ছিল প্রচুর।

সাহায্য হিসাবে আসা সৈন্যের পরিমাণ কম হলেও এরা সবাই ছিল চৌকস যোদ্ধা। পুরো বাহিনী থেকে বাছাই করে গঠন করা হয়েছিল এ বাহিনী। অভিযানের আগে ওদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। পরিমানে অল্প হলেও ময়দানে ওরা কি

ভয়ংকর তুফান সৃষ্টি করতে পারবে, জানতেন সুলতান। তাঁর শুধু একটিই আফসোস হলো, এ এলাকার পাহাড় ও টিলার প্রতিটি খাঁজের সাথে ওদের পরিচয় করানোর সময় পেলেন না তিনি।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহও এসে পৌঁছলেন সেখানে। তিনি বললেন, 'এইমাত্র হলব থেকে আমার এক গোয়েন্দা এসেছে। সে খবর এনেছে, খৃস্টানরা সম্মিলিত বাহিনীর তিনটি গ্রুপকেই তীর-ধনুক, গোলা-বারুদ এবং পাঁচশ করে ঘোড়া সাহায্য হিসাবে পাঠিয়েছে। গোয়েন্দা বলেছে, সে ওদের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে দেখে এসেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী, গোলা বারুদের ড্রামে উটের পিঠ বোঝাই হয়ে আছে। তবে কাফেলার সৈন্যদের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনা ও সতর্কতার ভাব নেই। তারা পথ চলছে এলোমেলো ভাবে, নিরুদ্বিগ্ন মনে। খৃস্টানরা ওদেরকে কয়েকটি করে মিনজানিক কামানও দিয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, শত্রুরা এ যুদ্ধে প্রচুর মিনজানিক কামান ব্যবহার করবে। তাদের সাথে প্রচুর গোলা বারুদ এবং অগ্নি নিক্ষেপকারী তীরও রয়েছে।'

খাওয়ার পর সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডো দলের কমাণ্ডারকে কাছে ডাকলেন। তাকে বললেন, 'তোমাকে তো সবকিছু আগেই বুঝিয়ে বলেছি। এখন তোমার কাজ কি করে আঞ্জাম দেবে সেটা তুমিই ভাল বুঝবে। তবে পরিকল্পনার সময় মনে রাখবে, যে পর্যন্ত শত্রুরা আক্রমণ না করে, সে পর্যন্ত তাদের ওপর কোন অতর্কিত আক্রমণ চালাবে না। সংবাদ অনুযায়ী তারা

সোজা হেম্মাতের পর্বতশ্রেণী ধরে এগিয়ে আসছে। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে তাদের গতি থেমে যাবে। আমি চাই না তারা ওভাবে মাঝপথে বাঁধাপ্রাপ্ত হোক। তোমাদের জানা দরকার, আমি পাল্টা আক্রমণ করতে চাই না। শত্রুরা আমার আক্রমণ বুঝতে পারবে তখনি, যখন আমি পিছন থেকে তাদের ওপর কেয়ামতের ঝড় তুলবো। আমার এ কথা তোমরা খেয়াল রাখবে।'

তিনি তাকে আরো বললেন, 'আমাদের মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হবে তখন, যখন শত্রুরা পিছন আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। তারা তখন ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে চেষ্টা করবে। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, এ পাহাড়ী এলাকা থেকে যেন শত্রুদের একটি সৈন্যও পালিয়ে যেতে না পারে। তাদের অধিকাংশকে জীবিত ধরে বন্দী করবে। কারণ তারা মুসলমান। যখন ওরা তোমাদের হাতে বন্দী হবে, তখন তারা হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারবে। অন্তত আমি তাই আশা করি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসে যারা তীর ছুঁড়বে এবং আমাদের তীরে বিদ্ধ হয়ে মারা যাবে, তাদের মৃত্যু আমরা ঠেকাতে পারবো না।'

তিনি কমাণ্ডারকে আরো বললেন, 'তোমরা এ খবরও পেয়েছো, শত্রুরা প্রচুর গোলা-বারুদ বোঝাই করে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। এগুলো ব্যবহার করার সুযোগ ওদের দেয়া যাবে না। তোমরা দশ-বারো জন দক্ষ কমাণ্ডো নিয়ে ছোট ছোট কয়েকটি গ্রুপ তৈরী করো। তাদের দায়িত্ব হবে গোলা-বারুদের স্তূপে

পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া। দিনের বেলা ওরা ভাল করে দেখে নেবে গোলা বারুদের স্তূপ কোথায় আছে। তারপর রাতে চুপিসারে ওখানে পৌঁছে আগুন ধরাতে হবে। সবচে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো. শত্রুরা এখনও নদীর কাছে আসেনি। তোমরা তোমাদের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে প্রস্তুত করে রাখো। নিজেদের মশকগুলোও পূর্ণ করে রাখো পানি দিয়ে! আবহাওয়া এখানে খুব ঠাণ্ডা। এটা মরুভূমিও নয় যে, কেউ এখানে পিপাসায় মারা যাবে। তবুও এটা যুদ্ধ পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, পানির অভাব সৈন্যদের দিশেহারা করে ফেলে।'

কমাণ্ডারকে বিদায় করে তিনি কায়রো থেকে আসা সৈনিকদের সালারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা' সবসময় মনে রাখবে, এটা মিশরের মরু অঞ্চল নয়। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে শীত খুব বেশী। সূর্য উঠলেও শরীর গরম হয় না। দিনের বেলায়ও শরীর গরম করতে হয় ছুটাছুটি করে। 'সুযোগ মত আঘাত হানো, আর যে কোন দিকে পালিয়ে যাও' এই পলিসিতে এখানে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এখানে লুকানোর যথেষ্ট সুযোগ ও জায়গা আছে। কি করে অতর্কিত আক্রমণ করে দ্রুত পালিয়ে আসতে হয় সে প্রশিক্ষণ তোমরা পেয়েছো। কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এখানে ময়দান খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। মরুভূমিতে তোমরা কয়েক মাইল চক্কর দিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাতে, ইচ্ছেমত পায়তারা করার জন্য সীমাহীন প্রান্তর পেয়ে যেতে। কিন্তু এখন

এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টিলার মাঝখানে সীমাবদ্ধ ময়দানে তোমাদেরকে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। এখন আর সে সময় নেই যে, তোমাদেরকে পাহাড়ী অঞ্চলের প্রতিটি টিলা ও সমতলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তাই এখানে নিজের বুদ্ধি বিবেককে সর্বোত্তম কাজে লাগাতে হবে তোমাদের। তীরন্দাজদেরকে পাথরের আড়ালে থেকেই নিশানা ঠিক করতে বলবে। আর ঘোড়াসওয়ারদের বলবে, ওরা যেন ওদের ঘোড়াগুলোকে কখনও উঁচু স্থানে নিয়ে না যায়। এখানে চড়াই উৎরাই এত বেশী যে, বার বার ওপর-নিচ করতে গেলে ঘোড়াগুলো দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

তিনি মিশর থেকে আগত সৈন্যদের সংরক্ষিত অবস্থায় রাখলেন। তাদের নেতৃত্ব দিলেন সুলতানের সাথে অবস্থানকারী সেনা অফিসারদের হাতে। কারণ এসব সেনাপতিদের হাতেই ছিল বর্তমান যুদ্ধের বিস্তারিত প্ল্যান ও নকশা।

০

পাহাড়ের চূড়ায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়লো আজানের সুমধুর সুর। সুলতান আইয়ুবী পোশাক পাল্টে তাবুর ভেতরই ফজরের সুন্নত আদায় করলেন। তারপর কোষমুক্ত তরবারী তুলে নিলেন হাতে। সুলতানের হাতের মুঠিতে এখন খাপ মুক্ত তলোয়ার। তিনি নিবিষ্ট মনে তলোয়ারের ধার ও চমক দেখতে লাগলেন। সহসা উদ্বেলিত আবেগে নড়ে উঠলো তার হৃদয়তন্ত্রী। তিনি তলোয়ার খাপে ভরে কেবলার দিকে মুখ

করে হাত তুললেন আকাশের দিকে। চোখ বন্ধ করে আল্লাহর দরবারে মিনতিমাখা স্বরে বলতে লাগলেন, 'হে মহান রাজাধিরাজ, হে সর্বশক্তিমান! যদি এ যুদ্ধে আমার পরাজয়ে তুমি সন্তুষ্ট হও, তবে তাতেই আমি রাজী-খুশী। আর যদি এ যুদ্ধে তুমি আমাকে সফলতা দান করো, তবে তা হবে তোমার অপার করুণা। সে ক্ষেত্রে তোমার দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। আজ এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, যারা তোমার প্রিয় হাবীব রাসূলে মকবুলের উম্মত বলে দাবী করছে নিজেদের। অথচ ইসলামের দুশমনদের প্ররোচনায় তারাই আজ ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। যদি আমার ফয়সালা তোমার দৃষ্টিতে না-জায়েজ হয়, তবে হে আল্লাহ! তুমি তোমার কুদরতি মদদে তা আমাকে জানিয়ে দাও। আমি আমার তলোয়ার খাপে পুরে সরে দাঁড়াবো এ লড়াই থেকে। কারণ তুমি তো আমার অন্তরের খবর জানো, জানো আমার এ লড়াই বীরের খেতাব অর্জন বা রাজ্য জয়ের জন্য নয়!

আমি তো শুধু ঐসব নারী ও শিশুদের আত্মার ক্রন্দন শুনে ছুটে এসেছি ময়দানে, যাদের মান ও সম্ভ্রম লুট করা হয়েছে কেবল এই অপরাধে যে, তারা তোমার রাসূলের উম্মত ছিল। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার অসহায় বান্দাগণ ডাকছে। ডাকছে সেইসব বনি আদম, যারা মুসলমান হওয়ার অপরাধে কাফেরদের হাতে এখনো কঠিন উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে। আমি তো অস্ত্র ধরেছি তোমার দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও তোমার প্রিয় হাবীবের উম্মতের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে। কেবল এ জন্যই

আমি অনবরত মরুভূমি, অরণ্য, আর পাহাড়ে, পর্বতে মাথা কুটে মরছি। আমি এগিয়ে চলেছি ইসলামের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসকে কাফেরদের অবৈধ অধিকার থেকে মুক্ত করতে, ওখানকার নিগৃহীত মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত বাঁচাতে। রাসূলের উম্মতেরই কিছু লোক আমার এ অগ্রযাত্রার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। হে প্রভু! তুমি আমাকে ইঙ্গিতে বলে দাও, তাদের রক্ত প্রবাহ করা আমার জন্য বৈধ না অবৈধ! হে আল্লাহ! আমি পথভ্রষ্টদের কাতারে শামিল হতে চাই না। যা সঠিক, যা সত্য, যা তোমার পছন্দ, তুমি আমাকে সে পথে পরিচালিত করো। তোমার আলোর ইশারা দেখাও প্রভু। আর যদি আমার পথই সঠিক হয়ে থাকে, তবে আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, ধৈর্য ও হিম্মত দান করো।'

তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন এবং এ অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলেন। এক সময় মাথা তুললেন তিনি। দাঁড়িয়ে সহসা তিনি দৃপ্ত পায়ে বাইরে চলে এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গিতে ছিল বলিষ্ঠতা ও গাম্ভীর্য। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে সেখানে যাচ্ছিলেন, যেখানে অন্যান্য সেনা কমাণ্ডার ও সৈন্যরা জামায়াতে নামাজের জন্য একত্রিত হয়েছিল। ততক্ষণে নামাজের জামায়াত দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে শামিল হয়ে গেলেন জামাতে। তাঁর এক পাশে তাঁর বাবুর্চি ও অন্য পাশে এক কমাণ্ডারের আর্দালী এসে দাঁড়িয়ে গেল জামাতে।

০

নামাজ শেষ করে সুলতান আইয়ুবী হিম্মাত পর্বতশ্রেণীর চূড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাস্তায় পর পর চারজন কাসেদের দেখা পেলেন তিনি। তারা মৌখিকভাবে সংবাদ পেশ করল সুলতানের কাছে। এরা ছিল তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্য। এদের দায়িত্ব ছিল হারান, হলব ও মুশালের সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতার সংবাদ বয়ে আনা। এ কাজ রাত দিন অনবরত চলছিল। সুলতান আইয়ুবী কাসেদদের বিদায় করে সামনে এগিয়ে চললেন। তার সঙ্গে ছিলেন সেনাপতি শামস বখত। তাঁর ভাই শাদ বখতকে সুলতান অন্যত্র নিয়োগ করে ছিলেন।

'শত্রুদের সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আপনার কি মনে হয়, আমরা এ সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে পারবো?' শামস বখত জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার কাছে এটা কোন সমস্যাই নয় যে, শত্রুরা কত সৈন্য এনেছে ও আমাদের কাছে কত সৈন্য আছে।' সালাহউদ্দিন আইয়ুবী উত্তর দিলেন, 'আমি অস্থির হচ্ছি শুধু এই ভেবে, শত্রুরা এখনও কেন আক্রমণ চালাচ্ছে না। আমাদের ঐ মুসলমান ভাইদের কাছে খৃস্টান উপদেষ্টা ও গোয়েন্দা আছে। খৃস্টানরা কি এতই আনাড়ী হয়ে গেল যে, তারা জানতেও পারলো না, মিশর থেকে আমাদের সাহায্য আসছে, আর আমরা সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবো না? যদি শত্রুরা তৎপর হতো তবে হয়তো এ সমস্যার একটা সমাধান বেরিয়ে

আসতো। শত্রুরা কেন এভাবে এসে বসে আছে, আর আমাদেরকে এত সময় দিচ্ছে যে, আমরা সাহায্য পর্যন্ত পেয়ে গেলাম, তাই আমার বুঝে আসছে না। আমরা তাদের গতিবিধির খবর পেয়ে যাচ্ছি, আমাদের সামরিক অশ্বগুলোকে পানি পান করাতে পারছি; এ সুযোগ ওরা কেন দিচ্ছে তাই ভাবছি আমি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, শত্রুরা এমন কোন চাল চালবে, যা হয়ত আমরা চিন্তা করতে পারছি না। আমার অবাক লাগছে এ জন্য, এরা তো এখানে খেল তামাশা করতে আসেনি।'

'যতদূর আমি এদের সম্পর্কে জানি, এদের কাছে কোন চাল নেই।' শামস বখত বললেন, 'আল্লাহর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আল্লাহই তাদের মন ও মস্তিষ্কে মোহর মেরে দিয়েছেন। কারণ তারা হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে গেছে। আমি তাদের এ আচরণে কোন গভীর ও ভয়ংকর বিপদ আছে বলে মনে করি না।'

'ভাই শামস বখত!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমারও আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে, কিন্তু আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবটাই দেখে থাকি। সত্যের ওপর মিথ্যাও কখনো কখনো বিজয়ী হয়। যখন সত্যের অনুসারীরা বাতিলের কাছে নতজানু হয় অথবা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে, বিজয় তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় অনেক দূরে। সত্য সব সময় চায় কোরবানী, যদি আমরা কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকি তবে সত্যের জয় অবশ্যই হবে। বাতিলের যে শক্তি আছে, তার

মোকাবেলা আমরা যুদ্ধের ময়দানেই করবো। আমাদের দৃষ্টি সব সময় সত্যের দিকে সদা সতর্ক রাখতে হবে। সেই সাথে শরীর ও মনের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে সত্যকে বিজয়ী করার জন্য। এর পরে যা ঘটে তা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এখন আমাদের যেমন আনন্দিত হওয়া উচিত নয়, তেমনি হতাশ হওয়ারও কোন কারণ নেই।'

তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। সেনাপতি শামস বখত, দু'জন উপদেষ্টা ও রক্ষীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সুলতানের দেখাদেখি তারাও সবাই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়লেন। সেনাপতি শামস বখত এবং দু'জন উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি উঁচু পাহাড়ী টিলায় পৌঁছলেন। টিলার উল্টো পাশে তাঁদের সামনে এক বিরাট সমতল উপত্যকা। উপত্যকাটি পর্বত শৃঙ্গের পাশ দিয়ে সামনে প্রশস্ত হয়ে এগিয়ে গেছে। সামনের উপত্যকাটির মতই তাদের পিছনেও সমান্তরাল উচ্চ ভূমি। তার মাঝ দিয়ে একটি গিরিপথ এগিয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। টিলার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিশেছে সামনের উপত্যকায়। বিশাল মাঠের মত খোলা উপত্যকাটি এতক্ষণ লুকিয়েছিল এই টিলার আড়ালে। সুলতান ও তাঁর সঙ্গীরা টিলায় উঠে দাঁড়াতেই তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই খোলা ময়দান। তাঁরা তাকিয়ে দেখলো, অদূরে ময়দানের মাঝে শত শত তাবু টানানো। একদিকে সৈন্যদের ঘোড়ার সারি বাঁধা। সিপাইরা সেখানে ঘোরাফিরা করছে। কেউ কেউ শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের মনে

এমন কোন ভয় নেই যে, তাদের ওপর কোন বাহিনী কখনো আক্রমণ করে বসতে পারে। যদি তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতো তবে তাদের তাবু মাটিতে পড়ে থাকতো। চারদিকে সতর্ক পাহারা থাকতো। তাদের অশ্বপৃষ্ঠে জীন আঁটা থাকতো।

'এই বাহিনীর সেনাপতি ও কমাণ্ডারদেরকে আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমরা তিনজন তা আবার শুনে নাও।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এমনও হতে পারে, তোমাদের আগেই আমি মারা যেতে পারি। যুদ্ধ শুরু হবার শুরুতেই যদি আমি মারা যাই তবে যুদ্ধের দায়িত্বভার তোমরা গ্রহণ করবে। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি, তোমরা তাঁবু টানিয়ে থাকতে পারো, অবসর অবস্থায় তোমরা ঘোরাফেরাও করতে পারো, কিম্বা এদিক-ওদিক বসে বা শুয়ে থাকতে পারো, কিন্তু তাঁবুতে তোমরা সব সময় অস্ত্র প্রস্তুত রাখবে আর ঘোড়ার পিঠে জীন এঁটে রাখবে। শত্রুর গোয়েন্দারা তোমাদের দেখছে। তাদেরকে বুঝিয়ে দাও, তোমরা শত্রুদের কোন খবর রাখো না। যখন শত্রু সৈন্য উপস্থিত হবে, তখন তোমরা এমন ভাব করবে, যেন খুব ভয় পেয়ে গেছো। তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের মোকাবেলা করবে না। শত্রু যদি তোমাদের আক্রমণ করে উপত্যকায় চলে আসে, তখন তোমরা যুদ্ধ করতে করতে আস্তে আস্তে পিছু হটে যাবে, যাতে তাদের পুরো সৈন্যদল এ উপত্যকায় এসে যায়। তারপর তারা যখন আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকে যাবে তখন শত্রুদের পিছু হটার সুযোগ দিও।

সুলতান আইয়ুবী দুই সমান্তরাল উপত্যকার মাঝামাঝি গিরিপথের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আমি আমার এ সৈন্যদের বলে দিয়েছি, তারা যেন এ গলির মধ্যে এসে আবার ফিরে যায়। তাদেরকে কোথায় একত্রিত হতে হবে সে স্থানও বলে দিয়েছি। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে সে জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এ দলগুলোকে শত্রুদের পিছনে যেতে হবে। এ উপত্যকায় আমরা শত্রুদের অভ্যর্থনার জন্য যে ব্যবস্থা করে রেখেছি, তা তোমরা জানো। বন্ধুগণ! তোমরা স্মরণ রেখো, এখানে আমাদের কোন অঞ্চল অথবা কোন দূর্গ জয় করা লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য শুধু শত্রুদেরকে অসহায় ও নিস্ক্রিয় করা, যাতে তারা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়।

আমি মুসলমান ভাইদেরকে দুশমন ভাবতে লজ্জাবোধ করি; কিন্তু অবস্থার চাপে আজ তাই করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি এদের ধ্বংস করতে চাই না, চাই নিরস্ত্র করতে। আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক শত্রুকে জীবিত বন্দী করতে। যুদ্ধ বন্দী হিসেবে আটকানোর পর আমি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করবো, তোমরা মুসলমান, তোমরা আল্লাহর সৈনিক। তোমাদের বাদশাহ তোমাদেরকে ইসলামের শত্রুদের খেলার পুতুল বানাতে চাচ্ছে।'

সেনাপতি শামস বখত বললেন, 'কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে সে জাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দাও' খৃস্টানরা এখন এ নীতিকে সফলভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'মুসলমান জাতির দৃষ্টান্ত বারুদের মত।' সুলতান আইয়ুবী

বললেন, 'এ জাতির আবেগে ঈমানী আগুন জ্বালতে হবে। তাদের আবেগের উত্তপ্ত বারুদের স্তুপে যদি কোন রকমে একবার ঈমানী আগুনের ছোঁয়া লাগানো যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটবে। মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে, বিলাসপ্রিয় রাজা বাদশা আর সাধারণ জনগণ সবার মাঝেই এ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। মানুষের আবেগ বারুদের চাইতেও তীব্রতর হয়ে বিস্ফোরিত হতে পারে। যদি কখনো জাতীয় জীবনে তেমন বিস্ফোরণ ঘটে তবে দুনিয়ার কোন শক্তির সাধ্য নেই তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে। যদি তাদের আবেগের ঘরে এ আগুন জ্বালানো না যায়, তবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াভহ পরিণতি। তখন এ জাতির আর কোন সহায় থাকবে না। খৃস্টানরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। জাতির নেতা ও আমীররা রাজ্য ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে এগিয়ে যাবে মৃত্যু ও ধ্বংসের দিকে। তারা একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে নিজেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বাদশাহ হতে গিয়ে ধ্বংস হবে নিজেরা, ধ্বংস করবে মিল্লাতকে। আমি এদের রাজ্য লিপ্সা ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে সঠিক ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার সামনে ইসলামের সুরক্ষা ও বিস্তার ঘটানো ছাড়া আর কোন কাজই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

০

হিম্মাত পর্বত শ্রেণীর অল্প দূরেই হারানের দুর্গ। দুর্গাধিপতি

গুমাস্তগীন নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি তার সেনাপতি ও ছোট বড় কমাণ্ডারদের একত্রিত করে বললেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টানদের পরাজিত করতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি তোমাদের সামনে আসবেন, আমার বিশ্বাস, তখন শিয়ালের সকল চালই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিনি এ দেশের লোক নন, কুর্দিস্তানের বাসিন্দা। তোমরা আরব, পাক্কা মুসলমান, দীনদার ও পরহেজগার। তিনি তো শুধু নামে মুসলমান। তিনি যত বড় ধূর্ত ও প্রতারকই হোক না কেন, তার প্রতারণার ফাঁদে আমরা পা দিতে পারি না। তিনি এদেশ দখল করে এ অঞ্চলের বাদশাহ হতে চান। আমি তার যুদ্ধের কলা-কৌশল তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি।

তাঁর কাছে বর্তমানে খুব অল্প সৈন্য আছে। তিনি সেই সামান্য সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আছেন। একটু আগে গোয়েন্দা জানিয়েছে, তার সৈন্যরা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে আরাম করছে। তাদের ঘোড়াগুলোও যুদ্ধের অবস্থায় নেই। এটা দুই কারণে হতে পারে, এক. তাঁর হয়ত বিশ্বাস, আমরা তাঁকে পরাজিত করতে পারবো না। অথবা তাঁর ধারণা, আমরা তার ওপর আক্রমণ করারই সাহস পাবো না। কিছুদিন পর তিনি আমাদের কাছে আপোষের জন্য দূত পাঠাতে পারেন। কিন্তু আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা তাঁর সঙ্গে কোন আপোষ মীমাংসা করবো না। তিনি তো এখন আমাদের হাতে বন্দী। যদি তাকে জীবিত দেখাতে না পারি তবে তাঁর লাশ তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। তোমাদের সৈন্যদের বলে

দাও, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ইমাম মেহেদী নন, কোন পয়গম্বরও নন। আর তার সেনাবাহিনীতে কোন জ্বীন-ভূতও নেই। আমরা তাঁর সৈন্য বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ করে শেষ করে দেবো। তাদের কাউকে পালানোরও সুযোগ দেবো না।

তিনি তাঁর শ্রোতাদের উত্তেজিত করে নিজের বিশ্রাম কক্ষে চলে গেলেন। তার বিশ্রাম কক্ষ মানে রাজ প্রাসাদের মত জমকালো এক তাবু। সে বিশাল কামরা জুড়ে বিছানো ছিল রঙিন গালিচা। গালিচার ওপর শাহী পালঙ্ক পাতা। পালঙ্কের পাশে মদের সুরাহী ও সুদৃশ্য পিয়ালা সাজিয়ে রাখা। ভেতর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল রাজ মহলের কামরা। আশেপাশে আরো অনেক তাঁবু, যেগুলো সৈন্যদের তাঁবু থেকে পৃথক ও মনোরমভাবে সুসজ্জিত ছিল। এগুলোতে নাচ-গানের মেয়েরা থাকতো। এসব তাঁবুর পাহারায় পাহারাদার নিযুক্ত ছিল।

গুমাস্তগীন ভাষণ শেষ করেই দ্রুত তার কামরায় ঢুকে গেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করতেই লাইন ধরে সুন্দরী মেয়েরা খাবারের সাজানো ডালি হাতে ভেতরে প্রবেশ করলো। গুমাস্তগীনের ইঙ্গিত পেয়ে ওরা খাবার পরিবেশন শুরু করলো। মদের সুরাহী এলো। গুমাস্তগীন নয়জন মেহমানকে সাথে নিয়ে খেতে বসলেন।

নয়জন মেহমানই খাবার প্লেটের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারা গোস্তের বড় বড় টুকরো হাতে নিয়ে গ্রোগ্রাসে গিলতে শুরু করলো। সেই সাথে মদও পান করতে লাগলো পানির মত। মদের প্রভাবে খাওয়া শেষ হবার আগেই ওদের

চোখে নেশার ঘোর লেগে গেল। চোখগুলো হয়ে উঠল রক্তের মত লাল।

তিন চারজন যুবতী তাদের পিয়ালায় মদ ঢেলে দিচ্ছিল। ওরা খাচ্ছিল আর সুযোগ পেলেই মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছিল। কেউ মেয়েদের বাহু ধরে টেনে নিজের কোলে বসাতে চাচ্ছিল। এভাবে খাওয়া ও মেয়েদের উত্যক্ত করার কাজ একই সাথে চলতে থাকে। গুমাস্তগীন তাদের এ অসভ্য আচরণ দেখে হাসতে থাকেন। কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ না বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে গুমাস্তগীন মেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং মেহমানদের সাথে গল্প-গুজবে মেতে উঠলেন। এক সময় বললেন, 'এখন আর গল্প করার সময় নেই। এখন তোমাদের যেতে হবে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে। খবরদার, এবারের আঘাত যেন শূন্যে না যায়।'

'আপনি যদি আমাদেরকে থামিয়ে এ মেহমানদারীতে আটকে না রাখতেন, তবে এতক্ষণে আপনি শুনতে পেতেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আর এ দুনিয়ায় নেই।' এক ব্যক্তি বললো।

এরা ছিল হাসান বিন সাবাহর সেই নয় ফেদাইন খুনী, যাদেরকে তাদের মুর্শিদ শেখ মান্নান ত্রিপলী থেকে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিল। এরা প্রকাশ্যে মানুষ হিসেবে পরিচিত হলেও স্বভাবে ছিল বন্য পশুরও অধম। তারা প্রত্যেকে তাদের ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল কেটে দশ ফোটা রক্ত

পিয়ালায় রেখে তার সঙ্গে মদ ও হাশিশ মিশিয়ে পান করে নিলো। তারপর তারা গুমাস্তগীনকে স্বাক্ষী রেখে শপথ করলো, 'সুলতান আইয়ুবীকে এ যাত্রায় হত্যা করবো আর হত্যা করতে না পারলে কেউ জীবিত ফিরে আসবো না।'

শেখ মান্নান তাদেরকে দুনিয়াত্যাগী দরবেশের পোশাকে পাঠিয়েছিল। তাদের হাতে ছিল তসবীহ, গলায় ছিল কোরআন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন এই পোশাকে, এই ভঙ্গিতেই সুলতান আইয়ুবীর কাছে গিয়ে পৌঁছায়। সুলতানের কাছে তাদের বক্তব্য হবে, মুসলমানের বিরুদ্ধে যেন কোন মুসলমান যুদ্ধ না করে। তারা বিবাদমান উভয় দলের মধ্যে আপোষ করার দায়িত্ব নেবে এবং শালিসী করতে গিয়ে এক গোপন বৈঠকে তারা সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করবে।

শেখ মান্নান পথটি ভালই বেছে নিয়েছিল। কারণ সুলতান আইয়ুবী ধর্মের ব্যাপারে খুবই উদার মনোভাবের লোক ছিলেন। তিনি ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে সমাদরে পাশে বসাতেন ও তাদের কথা আগ্রহের সাথে শুনতেন। তার দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল, কেউ মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব নিলে তিনি তাকে স্বাগত জানাতে কখনো কার্পণ্য করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, এতে খৃস্টানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও আক্রমণের সুযোগই নষ্ট হবে।

আপোষ রফার জন্য তিনি নিজেও হলব ও অন্যান্য স্থানে দূত পাঠিয়েছিলেন, যারা অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এখন এই জোব্বা পরা সুফী মানুষগুলো, যারা জোব্বার ভেতরে

খঞ্জর ও তলোয়ার লুকিয়ে তাকে ধোঁকা দিতে আসছে, তাদেরকে সরল বিশ্বাসে সহজেই সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন, এমনটি আশা করা মোটেই অন্যায় ছিল না। আর তিনি এমনটি করলে তাকে তারা সহজেই হত্যা করতে পারবে, এ বিশ্বাসও তাদের ছিল। ত্রিপোলী থেকে যাত্রা করে তারা সোজা হারানে গিয়ে পৌঁছেছিল। গুমাস্তগীনকে তার খৃস্টান উপদেষ্টারা বলেছিল, সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে আসা এ নয় ফেদাইন খুনীকে যেন তিনি সহযোগিতা করেন। এ জন্যই তিনি তাদেরকে সঙ্গে করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ না করেই যদি সুলতানকে হত্যা করা যায় তবে সে চেষ্টাই আগে করা উচিত।

তাদের বিদায় জানাতে গিয়ে গুমাস্তগীন বললেন, 'আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করছি। কিন্তু সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে তোমাদের যথেষ্ট হুশিয়ার থাকতে হবে। তোমরা যে সুফীর বেশ ধরেছ তাতে তার সন্দেহ হতে পারে। কারণ আইয়ুবীর দৃষ্টি শক্তি বড় প্রখর। তাছাড়া তাঁর ওপর অতীতেও কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, যা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তিনি এখন আরও সতর্ক থাকবেন। তাঁর সাথে আরও দু'জন হুশিয়ার ব্যক্তি আছে, একজন আলী বিন সুফিয়ান ও অন্যজন হাসান বিন আবদুল্লাহ। এরা প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষের অন্তরের কথা পর্যন্ত পড়ে নিতে পারে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী আমি জানতে পেরেছি. যদিও আলী বিন সুফিয়ান এখন কায়রোতে অবস্থান করছেন কিন্তু হাসান বিন আবদুল্লাহ তাঁর

কাছেই আছে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে কোন আগন্তুক দেখা করতে এলে একাধিক সেনাপতি ও হাসান বিন আবদুল্লাহ তাদেরকে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যদি তাদের সন্দেহ হয় তবে তারা দেহ তল্লাশীও নিতে পারে।

সুলতান আইয়ুবী বা হাসান বিন আবদুল্লাহর মনে এমন ধারণা আসতেই পারে, তোমাদের এ প্রস্তাবের পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে। নয়তো হঠাৎ আজ তোমাদের মনে এ আপোষের চিন্তা এলো কেন? আইয়ুবী আরও জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কোথাকার ধর্মীয় নেতা? তিনি এমন প্রশ্নও করতে পারেন, যে প্রশ্নের কোন সদুত্তর তোমরা দিতে পারবে না। তাতে তোমাদের মুখোশ খুলে যাবে। তিনি নিজে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ধর্ম ও ইতিহাসে তার গভীর পাণ্ডিত্যের কথা সবার জানা। তাছাড়া তোমাদের মুখে দাড়ি ছাড়া দরবেশীর আর কোন চিহ্ন নেই। তোমাদের চার জনেরই দাড়ি এখনও ছোট। তাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, মাত্র মাসখানেক আগে থেকে তোমরা দাড়ি বাড়ানো শুরু করেছো। তোমাদের চেহারায় মদ হাশিশের নেশা এখনও লেগে আছে। তোমাদের চেহারায় পবিত্রতার এমন কোন লেশ মাত্রও নেই, যা দেখে তিনি প্রভাবিত হবেন। বিদায় জানানোর মুহূর্তে এ কথাগুলো তোমাদের বলে দেয়া আমি জরুরী মনে করেছি। আশা করি আমার এ স্পষ্ট উচ্চারণে তোমরা কেউ অসন্তুষ্ট হওনি।'

কথাগুলো শুনে নয়জনের একজনও কোন প্রতি উত্তর করলো

না। তবে তাদের নেতা বললো, 'হ্যাঁ, আমরা আপনার প্রত্যেকটি কথায় একমত! যদি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আমাদেরকে সুফী দরবেশ মনে করে আপ্যায়ন করেন, সম্মান করেন এবং তাঁর তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যান, তবে আমার এ সাথীরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমাদের কারোরই সুফী দরবেশদের আদব কায়দা ভাল করে জানা নেই। এ অবস্থায় আপনি কোন পরামর্শ দিলে আমরা তা বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

'আমার মাথায় খুবই সহজ ও ঝুঁকিহীন পদ্ধতি আছে।' গুমাস্তগীন বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সাজিয়ে হিম্মত পর্বত শ্রেণীতে পাঠাতে চাই। তাঁর রক্ষীবাহিনীতে খুব বাছাই করে লোক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগের আগে তাদের বংশ পরিচয়ও নেয়া হয়। সে কারণে তোমরা যাওয়ার সাথে সাথেই রক্ষী বাহিনীতে নিয়োগ পাবে, তা মনে করো না। অবশ্য একটি কাজ করলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোয়েন্দা জানিয়েছে, দামেশকের লোকেরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পক্ষে বিরাট উদ্দীপনা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য আসছে। সুলতান আইয়ুবী সে সব স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিচ্ছেন। তোমরা এ সুযোগ নিতে পারো।'

তিনি একটি কাঠের বাক্স খুললেন। তার মধ্য থেকে নতুন পোশাক বের করে ফেদাইনদের বললেন, 'তোমরা এই

পোশাক পরে সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাও। এটা তাঁর রক্ষীবাহিনীর পোশাক। তোমাদের একজনের হাতে সুলতান আইয়ুবীর পতাকা থাকবে। অন্য আটজনের হাতে লাঠির সাথে সেনাবাহিনীর পতাকা থাকবে। তোমরা সোজাসুজি সুলতান আইয়ুবীর কাছে যেতে চাইবে। কিন্তু তাঁর রক্ষীরা তোমাদেরকে সরাসরি তার কাছে যেতে দেবে না। তারা তোমাদের বাঁধা দিলে তোমরা আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে বলবে, আমরা স্বেচ্ছাসেবক, দামেশক থেকে এসেছি। আমরা সুলতান আইয়ুবীর রক্ষী দলে ভর্তি হতে চাই। এ জন্য আমরা তার রক্ষী দলের পোশাক পর্যন্ত তৈরী করে নিয়ে এসেছি। সুলতান আইয়ুবীর হেফাজতের জন্য আমরা আমাদের জীবন কোরবান করতে চাই। আমাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর রক্ষী দলে অথবা কমাণ্ডো বাহিনীতে ভর্তি করে নাও। তারা গড়িমসি করলে বলবে, আমরা কিছুতেই ফিরে যাবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তোমাদেরকে সুলতানের কাছে যেতে না দিলে অনুনয় বিনয় করে বলবে, আমরা অনেক দূর থেকে বড় আশা নিয়ে এসেছি। আমাদেরকে অন্তত একবার সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দাও, তিনি আমাদের আর্জি মঞ্জুর না করলে আর তোমাদের বিরক্ত করবো না।

আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তিনি আবেগের বড় মূল্য দেন। তিনি তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবেন। লাঠির মাথায় পতাকা জড়ানো বর্শা তো তোমাদের হাতেই থাকবে। যদি তিনি বাইরে সাক্ষাৎ দেন, তবে তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে তার

কাছে যাবে। কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামবে না। কাছে গিয়ে বর্শা দিয়ে দেহ ঝাঁঝরা করে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে আসবে। তোমরা সকলেই তো জীবন বাজী রেখে শপথ করেছো। আমার মনে হয়, সাহস ও বুদ্ধি খাঁটিয়ে কাজ করতে পারলে তোমরা সকলেই জীবিত ফিরে আসতে পারবে। আমার বিশ্বাস, সুলতান আইয়ুবীকে ক্ষত-বিক্ষত দেখলে তার সৈন্যদের মাঝে নৈরাশ্য নেমে আসবে। যুদ্ধ করার পরিবর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে সবাই। যখন সৈন্যরা হতবিহবল হয়ে ভাবতে থাকবে, এমনটি কি করে ঘটলো, কি হলো, কি ব্যাপার এবং এ নিয়ে হৈ চৈ করতে থাকবে তখন তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারবে। আমি তোমাদেরকে এমন তাজাদম আরবী ঘোড়া দিচ্ছি, যেগুলোর পিছু ধাওয়া করা বাতাসের পক্ষেও অসম্ভব।'

'এটা তো খুবই চমৎকার পরিকল্পনা!' ফেদাইন খুনীদের সরদার উৎসাহিত হয়ে বললো, 'আমাদের সেই সাথী হতভাগারা আনাড়ী ও কাপুরুষ ছিল। কি লজ্জার কথা, তারা শয়ন অবস্থায় পেয়েও তাকে হত্যা করতে পারলো না, উল্টো তাঁরই হাতে মারা গেল। আর যারা বেঁচে গেল তারা ধরা পড়লো। এখন আমরা যাচ্ছি, যদি আমরা তার শিরচ্ছেদ করতে নাও পারি, তবে একথা অবশ্যই শুনতে পাবেন, সুলতান আইয়ুবী আর জীবিত নেই।'

'আর আমি যদি তাঁকে হত্যা করে ফিরে আসতে পারি তবে? তবে...' এক ফেদাই হেরেমের সুন্দরী মেয়েদের দিকে ইশারা

করে শয়তানী হাসি হেসে বললো, 'ওই সুন্দরীকে আমার চাই।'

গুমাস্তগীনও শয়তানী হাসি হেসে বললেন, তোমাদের মধ্যে যেই জীবিত ফিরে আসুক, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে খুন করে আসতে পারলে আমি তাকে এমন পুরস্কার দেবো, যাতে তার দীল ঠাণ্ডা হয়। খৃস্টানরা তাকে যে পুরস্কার দেবে তার থেকে অনেক বেশী ধন-সম্পদ আমি তাকে দেব, যে ধন-সম্পদের কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আর তোমাদের মধ্যে যে সুলতান আইয়ুবীর শির কেটে আনতে পারবে, তাকে তার পছন্দ মত দু'টি সুন্দরী মেয়ে চিরদিনের মত দান করে দেবো।'

ফেদাইনদের চোখগুলো লোভে আরো বড় হয়ে গেল। সেখানে খেলা করতে লাগল চিকচিকে অসভ্য উল্লাস। তারা খুশীতে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং হো হো করে হাসতে লাগলো। গুমাস্তগীন তাদের ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো। আগে কাজ, পরে পুরস্কার। এসো তোমাদেরকে দামেশক থেকে হিম্মাত পর্বতশৃঙ্গের দিকে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেই। তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে ঘুরপথে দূর দিয়ে ঘুরে দামেশকের রাস্তায় গিয়ে পৌছবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, রাস্তায় কেউ তোমরা কে এবং কোত্থেকে আসছো জিজ্ঞেস করলে শুধু এ কথাই বলবে, আমরা দামেশক থেকে আসছি। এখন যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছি। কারণ রাস্তায় তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো বাহিনীর সামনে পড়বে। যাও, এখন বিশ্রাম করো, রাতে যাত্রা করবে।'

'রাতে! কেন, এখন রওনা করা যায় না?' এক ফেদাইন জিজ্ঞেস করলো।

'না, দিনের বেলা এখান থেকে বেরোনো ঠিক হবে না।' গুমাস্তগীন উত্তর দিলেন. 'তোমাদেরকে অনেক রাস্তা ঘুরে যেতে হবে। দু'দিন পর গিয়ে পৌছবে সেখানে। আস্তে ধীরে পথ চলবে। ঘোড়াগুলোকে কিছুতেই ক্লান্ত করবে না। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে পালানোর সময় বিপদে পড়ে যেতে পারো।'

গুমাস্তগীন কাঠের বাক্স থেকে পোশাক বের করে ওদের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'নাও, পরে দেখো গায়ে ঠিকমত লাগে কিনা!' এরপর আস্তাবলের দারোগাকে ডেকে বললেন, 'একটু আগে যে ঘোড়াগুলোকে আমি বেছে আলাদা করে রেখেছি, এদের জন্য সে নয়টি ঘোড়া নিয়ে এসো।'

মাঝ রাতের পর নয়জন অশ্বারোহী ক্যাম্প থেকে বের হয়ে সোজা দামেশকের পথে রওয়ানা হলো। অগ্রবর্তী অশ্বারোহীর হাতে সুলতান আইয়ুবীর পতাকা, অন্য আটজনের বর্শার ফলকের মাথায় সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর ছোট ছোট পতাকা জড়ানো।

০

গুমাস্তগীন যে দিন তার সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের সামনে উত্তেজিত ভাষণ দিয়েছিলেন, সে দিনেরই ঘটনা। হলবে সাইফুদ্দিনও তার সৈন্যদের সামনে অনুরূপ আগুন ঝরা ভাষণ দান করলেন।

সাইফুদ্দিনের ভাষণ শেষে সৈন্যদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন হলবের সেনাপতি। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বজ্রকণ্ঠে সৈন্যদের বললেন, 'এই সেই সালাহউদ্দিন, যিনি গত বছরও হলব অবরোধ করেছিলেন। তোমরাই এ সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও তাঁর অপরাজেয় বাহিনীকে বিতাড়িত করেছিলে। কাবার প্রভূর কসম! সুলতান সালাহউদ্দিন ও তাঁর বাহিনী যে দূর্গ বা শহর অবরোধ করে, জয় ছিনিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় না। সেই তিনি কেন হলব জয় করতে পারলেন না? কেন অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? কারণ তোমরা সিংহ! তোমরা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করার সৈনিক! তোমরা শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে তাঁর ওপর যে আক্রমণ চালিয়েছিলে, তিনি সে আক্রমণ সহ্য করতে পারেননি। বিজয় তাদেরই হয়, যাদের আল্লাহ বিজয় দান করেন। আর আল্লাহ তাদেরই বিজয় দান করেন, যাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমাদের ওপর ছিল বলেই তোমরা সেদিন বিজয়ী হয়েছিলে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর আল্লাহ কেমন করে খুশী থাকবেন? তিনি তো ডাকাত! লুটেরা! তিনি অবৈধভাবে দামেশকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। তার দাপটের কাছে মানুষের জান-মাল নিরাপদ নয়, নিরাপদ নয় নারীর সম্মান ও ইজ্জত। তার কারণেই আমাদেরকে দামেশক ছেড়ে হলবে আসতে হয়েছে। হে আল্লাহর সৈনিক! মুসলমান হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো, আইয়ুবীর বিরুদ্ধে

অস্ত্র ধরার সময় এ কথা চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। ওই মুসলমান কাফেরের চেয়েও খারাপ, যে মুসলমানের দেশ কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এ জালেম আমাদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। আর কোরআন জালেমের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ করে দিয়েছে। তাই তোমাদের যদি দেশের ওপর মায়া থাকে, নিজের ওপর মায়া থাকে আর নিজের বুকে থাকে ঈমানী আগুন, তাহলে জালেম আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাকে হত্যা করে দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করা তোমাদের ওপর ফরজ হয়ে গেছে।

হে খেলাফতের রক্ষীরা! তোমাদের শত্রু খৃষ্টানরা নয়, তোমাদের শত্রু এখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও তাঁর সৈন্য বাহিনী। খৃস্টানদেরকে মুসলমানের শত্রু তিনিই বানিয়েছেন। নূরুদ্দিন জঙ্গী জাতির ওপরে সবচে বড় অবিচার করে গেছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে মিশরের আমীর করে। অথচ এ ব্যক্তি সামান্য একটি সেনাদলের কমাণ্ডার হওয়ারও যোগ্য ছিল না। আমি তাকে আমার বাহিনীতে সাধারণ সৈন্য হিসেবেও রাখবো না।

বন্ধুরা! 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। আইয়ুবীর এখন সেই পাখা গজিয়েছে। মৃত্যুই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এ পাহাড়ী অঞ্চলে। এখন তাঁর সামনে আছে তোমাদের উদ্যত তলোয়ার ও বর্শা। সামনে আছে তোমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। আর তাঁর পিছনে নিরেট পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চল।

তোমাদের এ বিশাল বাহিনী তার গুটিকয় সৈন্যের সামনে যখন যাবে, আমার আফসোস হচ্ছে, পিঁপড়ের মত পিষে মারার জন্য অনেকেই তার কোন সৈন্য ভাগে পাবে না।

বন্ধুরা আমার! তোমাদেরকে হলব অবরোধের প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে তার জুলুম ও বর্বরতার। এখন যদি তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে সেই পাহাড়ী প্রান্তরে পিষে মারার জন্য ছুটে না যাও, তবে মনে রেখো, এই অহংকারী জালেম আবারও সোজা হলবের পথ ধরবে। কারণ তাঁর দৃষ্টি হলবের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি তোমাদেরকে তার গোলাম বানাবে, তোমাদের বোন ও বেটিরা তার সেনাপতিদের হেরেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, যদি তোমরা এটা না চাও, তবে এখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আমার এ কথার গুরুত্ব বুঝতে না পারো, তবে তাকাও নূরুদ্দিন জঙ্গীর মাসুম সন্তানের দিকে। যে নূরুদ্দিন জঙ্গী সারাটা জীবন মিল্লাতের সেবায় কাটালো, বলো, কি অপরাধ করেছিল তার নাবালগ সন্তান? কেন তাকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হতে হলো? কে করলো তার এতবড় সর্বনাশ? তাকাও মুশালের আমীর সাইফুদ্দিনের দিকে। তাকাও হারানের দুর্গাধিপতি গুমাস্তগীনের দিকে। কেন সবাই আজ আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে? কেবল আইয়ুবীই হকের পথে আছে আর অন্য সবাই মিথ্যাবাদী? আইয়ুবী! তুমি আর কতো ধোঁকা দেবে আমাদের? নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর কতো রক্ত ঝরাবে মুসলমানের? সালাহউদ্দিন! ক্ষমতার নেশায় ইসলামের তিন-তিনটি শক্তির

বিরুদ্ধে একত্রে মাথা তুলতে গিয়ে যে বোকামী তুমি করেছো, এবার তার মাশুল দিতে হবে। তোমাকে দলিত-মথিত করার জন্য ওই দেখো যুদ্ধের ময়দানে ছুটে আসছে মুসলমানদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি।

বন্ধুরা আমার! জাতির গাদ্দারকে পিষে মারার এ অভিযানে তোমরা কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকার পাত্র নও, এ কথা তোমাদের প্রমাণ করতে হবে। দেশ, জাতি ও ঈমানের স্বার্থে আপন ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাতেও তোমাদের কারো হাত কাপঁবে না, আমি কি তোমাদের কাছে এ আশা করতে পারি?'

সৈন্যরা ততক্ষণে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। ভেতরে সবার মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। সেনাপতির প্রশ্নের জবাবে সৈন্যরা আবেগ ও উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে সমস্বরে ধ্বনি তুললো, 'আইয়ুবীর গোলামী, মানি না মানবো না; বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন, নিভবে পেলে আইয়ুবীর খুন; আইয়ুবীর খুন চাই, আইয়ুবী তোর রক্ষা নাই!' সৈনিকদের গগন বিদারী শ্লোগানে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো।

সাইফুদ্দিন হাত ইশারায় সৈন্যদের থামতে বললেন। তাদের শোরগোল একটু কমলে তিনি বললেন, 'কেবল শ্লোগান দিলে হবে না। এ মুহূর্তে আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কে আলেমদের ফতোয়া শোন।' তিনি দু'জন আলেমের ফতোয়া সৈন্যদের সামনে পড়ে শোনালেন। ফতোয়ায় বলা হলো, 'আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্য ফরজ। যারা যুদ্ধ করবে, যুদ্ধের সময় তাদের কারো

রোজা রাখার দরকার নেই।'

এ ফতোয়ায় সৈন্যরা খুবই খুশী হলো। সাইফুদ্দিন বললেন, 'আমরা সে সময় আক্রমণ চালাবো, যখন সালাহউদ্দিনের সৈন্যরা রোজা রেখে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের পরের মঞ্জিল হবে দামেশক। কারণ অপরিসীম সম্পদ ও অর্থ পড়ে আছে সেখানে। দু'দিন পর সে সব সম্পদ হবে তোমাদের।'

০

একদিকে সম্মিলিত বাহিনী তাদের প্রস্তুতি শেষ করে তৈরী হচ্ছিল যুদ্ধের জন্য। অন্যদিকে সুলতান আইয়ুবী তার সৈনিকদেরকে আট-দশ জনের ছোট ছোট কমাণ্ডো গ্রুপে ভাগ করে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যুদ্ধের পরিকল্পনা। সুলতান আইয়ুবী তাঁর সৈন্যদেরকে কোন উত্তপ্ত ভাষণ দিয়ে বা আবেগময় কথা বলে তাদের উত্তেজিত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর দৃষ্টি শুধু ঐ জমিনের ওপর স্থির ছিল, যে ময়দানে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। সে ময়দানের উঁচু-নিচু টিলা-টক্কর থেকে কিভাবে অধিক থেকে অধিকতর সুবিধা লাভ করতে পারবেন, তাই শুধু চিন্তা করছিলেন তিনি। তিনি কথা বলছিলেন সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায়। আর এসব কথা বলছিলেন কেবল তাঁর জুনিয়র ও সিনিয়র কমাণ্ডারদের সাথে। তার প্রতিটি কথাতেই ছিল বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়।

তিনি কেবল তখনই একটু বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, যখন তাঁর ফিলিস্তিনী মুসলমান ভাইদের কথা স্মরণ হয়।

তাদের উদ্ধারের পথে বাঁধা হয়ে আছে আজ তারই স্বজাতি, মুসলমানরাই মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা স্মরণ হলেই তিনি বেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। আফসোস! এ সমস্যার কোন সহজ সমাধান নেই। আপোষ-মীমাংসার জন্য দূত পাঠিয়ে এ জন্য তিনি নিজেকে লজ্জিতও করেছেন। তাই এখন যুদ্ধ ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই।

তিনি মিশর থেকে আসা সৈন্য সাহায্য কিভাবে ব্যবহার করবেন সে পরিকল্পনা সমাপ্ত করেছেন। এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শত্রুর আক্রমণের। শত্রুর পথপানে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে জ্বালা ধরে গেল। তিনি তার উপদেষ্টাদের বললেন, শত্রুরা হয়ত চাচ্ছে, আমি পাহাড়ী এলাকার বাইরে গিয়ে ওদেরকে আক্রমণ করি। কিন্তু আমি পাহাড়ী এলাকা ছাড়তে একদম প্রস্তুত নই।'

সুলতান আইয়ুবী যদি চাইতেন, তবে তিনি তাঁর কমাণ্ডো বাহিনী দিয়ে শত্রুদের ক্যাম্প এরই মধ্যে তছনছ ও ধ্বংস করে দিতে পারতেন। তাঁর যুদ্ধের এটা একটা বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু এবারই প্রথম তিনি তাঁর এ বিশেষ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেননি। কমাণ্ডো বাহিনীকে তিনি সজ্জিত করে রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি জানতে চাচ্ছিলেন, শত্রুরা কোন চালে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। এ জন্য তিনি গভীর মনযোগের সাথে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছেন।

দামেশক। সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী নেই, কিন্তু তাঁর শৌর্য বীর্য নিয়ে ঝলসে উঠলেন তাঁর বিধবা স্ত্রী। যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারেননি তিনি, যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তার মতে এ যুদ্ধ সুলতান আইয়ুবীর নয়, এ যুদ্ধ সমগ্র জাতির। তিনি আরও মনে করেন, কোন ক্ষুদ্র ময়দানে এ যুদ্ধ সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধ চলছে সমগ্র দেশে। অতএব তিনি যেখানে আছেন সেখানে থেকেই এ যুদ্ধে ভূমিকা রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সুলতান আইয়ুবী প্রতি মুহূর্তেই সারা দেশের কোথায় কি ঘটছে সংবাদ পাচ্ছিলেন। জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর তৎপরতার খবর পেয়ে তিনি কেবল খুশীই হলেন না, নতুন আশা, উদ্দীপনা ও সাহসেও সঞ্জীবিত হলেন।

সুলতান আইয়ুবী দামেশক থেকে বের হবার পর এই মহীয়সী মহিলা নিজ উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তুলতে শুরু করেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে আহত সৈনিকদের বের করে আনা, দ্রুত রক্ত বন্ধ করা, জখমে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা, এসব ট্রেনিং দিতে শুরু করেন তাদের। সেই সাথে তিনি তাদেরকে তলোয়ার চালানো, বর্শা নিক্ষেপ ও তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণও দিয়ে যাচ্ছেন। এ কাজে তিনি ব্যবহার করছেন অবসরপ্রাপ্ত পুরুষ সেনা অফিসারদের।

সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের ময়দানে নারীদের টেনে নেয়া পছন্দ করেন না, এ কথা তিনি জানতেন। মেয়েদেরকে সেনাবাহিনীতে পৃথক কোন বাহিনী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন

আইয়ুবী, এমনটিও তিনি আশা করেননি। তারপরও তিনি মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন এক অন্তর্গত প্রেরণায়, যদি পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়ে যায়! যদি মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষায় নিজেদেরই এগিয়ে যেতে হয়!

জেহাদের জন্য মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করা এবং ট্রেনিং দেয়ার কাজ অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, কাউকে এ কথা বলতে হয় না, তোমার মেয়েকে নার্সিং ও সামরিক ট্রেনিংয়ে পাঠাতে হবে। বরং লোকেরা স্বত:স্ফূর্তভাবেই মেয়েদের ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে দেয়। দামেশকের পথে হাঁটতে গেলে দেখা যায়, দশ বারো বছরের কিশোরীরাও এখন কাঠের তলোয়ার বানিয়ে মাঠে মাঠে তলোয়ার ফাইট খেলে।

একদিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর কাছে এলো নতুন চারটি মেয়ে। সুলতান আইয়ুবীই ওদেরকে দামেশকে পাঠিয়েছেন। ওদের একজন হচ্ছে ফাতেমা, যাকে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা গুমাস্তগীনের অন্দর মহল থেকে বের করে এনেছিল। দ্বিতীয় জন মুশালের খতিব ইবনুল মাখদুমের কন্যা মানসুরা সায়েকা।* আর অন্য দু'জন ছিল সেই মেয়ে, যাদেরকে হলব থেকে গুমাস্তগীনের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়েছিল এবং সেনাপতি শামস বখত ও শাদ বখত হাররানের কাজীকে হত্যা করে তাদের মুক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিল আইয়ুবীর কাছে। এ

---

* তার বিস্তারিত পরিচয় পাবেন ক্রুসেড-১৩ পাপের ফল-এ।

দু'জনের নাম ছিল হুমায়রা ও সাহারা।
এদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠানো হলে সুলতান তাদেরকে সেখান থেকে দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই অভিভাবকহীন এ চার মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর কাছে।
যখন নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর হাতে ওদের তুলে দেয়া হলো, তখন দামেশকের মেয়েরা সেখানে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। ওরা দেখতে পেল, কেউ সেখানে অসি চালনা শিখছে, কেউ তলোয়ার চালাচ্ছে, কেউবা আবার আহত সৈনিককে কিভাবে দ্রুত ব্যাণ্ডেজ করতে হয় তার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মেয়েরা এ সব দেখে উদ্দীপিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আবেদনের সুরে বললো, 'মোহতারেমা, আমাদেরও আপনি এ প্রশিক্ষণার্থীদের দলে শামিল করে নিন।'
তিনি বললেন, 'তোমাদের এ আশা অচিরেই পূরণ হবে। আমি তোমাদের নাম তালিকাভুক্ত করে নিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমরা কে কোত্থেকে কিভাবে এখানে এলে সে কাহিনী শুনতে চাই।'
মেয়েরা প্রত্যেকেই জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর কাছে তাদের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনী তুলে ধরলো। তিনি তন্ময় হয়ে তাদের কাহিনী শুনলেন এবং বললেন, 'তোমাদের জীবন কাহিনী তো বড়ই বৈচিত্রময়! এ কাহিনী সবারই জানা দরকার।'
তিনি তাদেরকে প্রশিক্ষণরত মেয়েদের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে আবার তারা উপস্থিত মেয়েদের সামনে তাদের

জীবনের ইতিহাস তুলে ধরলো। তাদের শোনালো, শত্রুরা তাদের ওপর কি কি নির্যাতন করেছে। খতিবের মেয়ে মানসুরা ছিল শিক্ষিত ও যথেষ্ট বুদ্ধিমতি। সে মেয়েদের বললো, 'মেয়েদের বড় সম্পদ তার সম্ভ্রম। শত্রু যখন কোন দেশ বা শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন বিজয়ী সেনা বাহিনীর হাতে প্রথমেই ধরাশায়ী হয় নারী জাতি। দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এসব সৈন্যদের লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মেয়েদের ওপর। তখন ওরা আর মানুষ থাকে না, হয়ে যায় বন্য পশুরও অধম। তোমরা হুমায়রা ও সাহারার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছ, যে অঞ্চলে খৃস্টানদের আধিপত্য রয়েছে, সেখানে খৃস্টানরা মুসলমান নারীদের ওপর কি ভয়াবহ নির্যাতন চালাচ্ছে। সেখানে কোন মুসলমান মেয়ের সম্ভ্রবই নিরাপদ নয়। আল্লাহ না করুক, যদি কোন দিন দামেশকেও খৃস্টানদের আধিপত্য বিস্তার হয়, তবে তোমাদের অবস্থাও হবে সেইসব নির্যাতীতা বোনদের মত। যদি আজ আমরা দেশ ও জাতির জন্য কোরবানী দিতে এগিয়ে না আসি, তবে পরিস্থিতি আমাদেরকে একদিন এমন কোরবানী দিতে বাধ্য করবে, যার কথা কল্পনা করতেও আমার গা শিউরে ওঠে। খৃস্টানরা আমাদের পুরুষদের বানাবে তাদের গোলাম আর আমাদের বানাবে তাদের দাসী। তোমরা হয়তো জানো, তারা আমাদের অনেক ওমরাকে ক্রয় করে নিয়েছে। ফলে এখন খৃস্টানরা যেমন আমাদের শত্রু, তেমনি শত্রু খৃস্টানদের দোসর মুসলমানরাও। যদি আমরা বিজয় লাভ করতে চাই, তবে প্রতি

মুহূর্তে শত্রু-মিত্র সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে সতর্ক সজাগ। জেহাদের প্রেরণায় সব সময় আমাদের থাকতে হবে উজ্জীবিত। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেন, যে জাতি সেই সন্তানদের ভুলে যায়, যারা বিজাতি ও কাফেরদের বর্বরতার শিকার হয়েছে, সে জাতি বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

প্রিয় বোনেরা! আমরা সম্মানিত সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পতাকাতলে সমবেত হয়েছি নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করার জন্য। দ্বীনের কারণেই আজ আমরা তার অনুসারী! তিনি যদি দ্বীনের জন্য তাঁর জীবনকে বাজি রাখতে পারেন, তবে আমরা কেন পারবো না? তিনি যদি শাহাদাতের গৌরব অর্জনের জন্য নিজেকে পেশ করতে পারেন আল্লাহর দরবারে, তবে আমাদেরকে কেন তিনি সে গৌরবের হিস্যা থেকে বঞ্চিত করবেন? তিনি আমাদের নেতা, তাঁর হুকুমে আমরা আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, ফাঁসিতে ঝুলতে পারি, কিন্তু জেহাদের ময়দান থেকে সরে দাঁড়াতে পারি না। তাঁর এ নিয়ম আমরা মানতে রাজী নই যে, নারীরা যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারবে না। নারীদেরকে এত দুর্বল মনে করা উচিত নয়। আজো যুবতী ও সুন্দরী মেয়েদেরকে ধনী ও আমীরদের মহলের সৌন্দর্য বাড়াতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী বানানো হচ্ছে। এতে জাতির অর্ধেক শক্তি দুর্বল ও বেকার হয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছে, তার তুলনায় আমাদের সৈন্য অর্ধেকও নয়। আমরা পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করবো এবং পুরুষ সৈন্যের ঘাটতি

পূরণ করবো। আমরা মুশালে গোয়েন্দাদের সঙ্গে ছিলাম, সেখানে আমরা যুদ্ধ করে এসেছি। পরিস্থিতির কারণে আমরা সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার আব্বা আবেগের অতিশয্যে মুশালের আমীরের কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে তার মতামত ও সত্যকে ব্যক্ত করে ফেলেছিলেন। এর মাধ্যমে তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও হয়তো এটা ছিল হেকমতের খেলাফ। যদি তিনি সেখানে গ্রেফতার না হতেন তবে আমাদের প্ল্যান হতো অন্য রকম। আমরা আমাদের আরাধ্য কাজ সমাধা না করেই সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

আমার কথায় তোমাদের মনে হতে পারে, সুলতান আইয়ুবী দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে মেয়েদের অংশ গ্রহণের বিরোধী। কিন্তু এ ধারনা সঠিক নয়। এটা সঠিক হলে তিনি মোহতারেমা জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই যে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চলছে, তা বন্ধ করে দিতেন। মুশালে আমরা যে তৎপরতা চালাচ্ছিলাম, তাও নিষিদ্ধ করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এই ব্যাপকতর সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের নেতা হিসাবে তিনি যা চিন্তা করেছেন, ঠিকই করেছেন। তিনি চান, আমরা যেন আগে আমাদের স্বামী, ভাই ও সন্তানদের জেহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দেই। জাতির যেসব সন্তান গাদ্দার হয়ে গেছে তাদেরকে যেন গাদ্দারীর পথ থেকে ফিরিয়ে আনি। জাতির মধ্যে যেন জাগরণ ও প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তুলি। আর সব সময় যেন চোখ-কান খোলা রেখে পাহারা দেই পরিবারের প্রতিটি

সদস্যকে। তিনি আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ অনুমোদন করে এ কথাও বুঝাতে চান আমাদের, সময় যদি কখনো নারীদের খুন দাবী করে ইসলামের জন্য, তিনি সে দাবী অগ্রাহ্য করবেন না। তাই সময় আমাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়ার দাবী জানাচ্ছে। তিনি যখন সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য আমাদের ডাক দেবেন, তখন যেন আমরা তাদের বোঝা হয়ে না যাই। অদক্ষতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ যেন আমাদের বিরুদ্ধে না উঠতে পারে সে জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং দরকার আমাদের। আমাদের যোগ্যতাই বলে দেবে জেহাদের এ পর্যায়ে কোন ভূমিকা আমাকে পালন করতে হবে।'

সায়েকার এ ভাষণ এবং অন্য তিনজনের জীবন কাহিনী শুনে উপস্থিত মেয়েদের প্রাণে নবতরঙ্গের হিল্লোল বয়ে গেলো। জেহাদী জযবা ও জোশে উদ্দীপিত হয়ে উঠলো প্রতিটি অন্তর।

চারশ মেয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল ওখানে। কয়েকদিন পরই তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলো। ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রতিটি মেয়েই ছিল বলতে গেলে এক পায়ে খাঁড়া। তাদের আগ্রহ ও জযবা দেখে জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

নবাগত এ চার মেয়ে মাত্র কয়েক দিন হয় প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছে। তখনো তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়নি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের সাথে তারাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু তাদেরকে ট্রেনিং শেষ করার তাগিদ দিয়ে বলা হলো, 'আগে ট্রেনিং শেষ করো, এরপর নিশ্চয় তোমাদের আশা পূরণ

করা হবে।'

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ওরা জেদ ধরে বসলো। বললো, 'আমাদের আপনি ময়দানে পাঠিয়ে দেখুন, আমরা আপনাকে নিরাশ করবো না। এখানকার প্রশিক্ষণ হয়তো আমাদের পূর্ণ হয়নি, কিন্তু জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের যে ট্রেনিং দিয়েছে, তার কোন তুলনা হয় না।' কিন্তু এবারও তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হলো।

তাদের মনের মধ্যে তখন ধিকিধিকি জ্বলছিল অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার অসহ্য যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার কথা স্মরণ হতেই মনের ভেতর প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠলো। কিন্তু যুদ্ধে যাবার অনুমতি না পাওয়ায় তার সাথে শামিল হলো অক্ষমতার খেদ। ফাতেমা, হুমায়রা ও সাহারা তিনজনই মনের দুঃখে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে যখন তারা চোখ ফুলিয়ে ফেললো তখন মায়া হলো মরহুম জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর, তিনি দয়াপরবশ হয়ে চারশ নারী স্বেচ্ছা বাহিনীর সাথে এ চারজনকেও যুক্ত করে দিলেন। তাদের সাথে রওনা হলো একশো সুশিক্ষিত পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক। এ স্বেচ্ছাবাহিনীর কমাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত হলো হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাস।

জঙ্গীর মহিয়সী বিধবা পত্নী হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাসকে একটি লিখিত চিঠি দিয়ে বললেন, 'এ চিঠি ভাই সালাহউদ্দিনকে দেবে। আমি সবকিছু চিঠিতেই বলে দিয়েছি। তুমি তাঁকে বলবে, এ মেয়েদেরকে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ মেয়ে ও পুরুষ রক্ষীদের

প্রতি তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং তোমার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। পুরুষদের সবাইকেই কমাণ্ডো আক্রমণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মেয়েরাও যুদ্ধ করতে পারবে। আহতদের সেবা করা ছাড়াও প্রয়োজনে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে পারবে আইয়ুবী। আমি মেয়েদের বলে দিয়েছি, শত্রুদের হাতে পড়লে তোমরা কেউ জীবিত ফিরে আসবে না। তারা নিজেরাও অঙ্গীকার করেছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়বে, কিছুতেই শত্রুর হাতে ধরা দেবে না।'

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর চারশ মেয়ে ও একশ পুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসলো। দামেশক শহরের সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে এলো তাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে। তারা যখন চলতে শুরু করলো, জনতা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গায়ে ফুল ছিটিয়ে দিতে লাগলো। এক কবি মাইকে তখন কবিতা পড়ছে,

'সামনে এগিয়ে চলো বীর মুজাহিদ
মুক্তির মিছিলে– দাও সাড়া দাও
জেহাদের ময়দান ডাকছে ব্যাকুল
তোমার দৃপ্ত পা– সামনে বাড়াও।
ভাইদের সাথে আজ বোনেরা শামিল
পুষ্পিত হাতে হাতে বিষমাখা তীর
বিস্ময়ে হতবাক বিমুগ্ধ নিখিল
অবাক তাকিয়ে দেখে মহীয়সী বীর।'

উল্লসিত জনতা ধ্বনি দিতে থাকে, 'দামেশকের বীর সন্তান, সামনে এগিয়ে যাও, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বলবে,

দামেশকের সমস্ত নারী-পুরুষ আইয়ুবীর সৈনিক।'
মুরুব্বীরা তাদের দিকে হাত নেড়ে দোয়া করছিল, 'আল্লাহ তোমাদের সফলতা দান করুন। ইসলামের কোন শত্রুকে জীবিত রেখে যেন তোমাদের ঘরে ফিরতে না হয়।'
শহরের অনেক লোক ঘোড়া ও উটে চড়ে শহর থেকে বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাদের সাথে এগিয়ে গেল। এক সময় হাজ্জাজ কাফেলা থামিয়ে আগত লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'বন্ধুরা, এবার ফিরে যাও। এখন ফিরতি পথ না ধরলে ইফতারের আগে তোমরা শহরে পৌঁছতে পারবে না।'
রমজান মাস। বিকেলে এক জায়গায় তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন বাহিনী প্রধান হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাস। বিশ্রামের জন্য থেমে গেল কাফেলা। ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসছিল। যাত্রা বিরতির পর মেয়েরা রান্না-বাড়ার কাজে লেগে গেল। পুরুষরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাঁবু টানাতে।
তখন চলছিল এপ্রিল মাস, পুরো শীতের মওসুম। রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। কাফেলায় ঘোড়ার সাথে উটের বহরও ছিল। উটের পিঠে ছিল সামানপত্র ও তাঁবু। কিছু তাঁবুর মধ্যে তলোয়ার, বর্শা ও তীর-ধনুক লুকানো ছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা উটের পিঠ থেকে সেসব তাবু নামাচ্ছিল।
সূর্য অস্ত যাওয়ার একটু আগে বারোজন অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হলো সেখানে। সুলতান আইয়ুবীর টহল বাহিনী। চলাচলের পথ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব ছিল এদের ওপর। তারা কাফেলার কাছে এসে দেখতে পেল, কাফেলায় মেয়েদের

সংখ্যাই বেশী, পুরুষ কম। তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গতিবিধি ও তৎপরতা লক্ষ্য করতে লাগল।

অশ্বারোহীদের আসতে দেখে কাফেলার সরদার হাজ্জাজ আবু ওয়াক্কাস সামনে এগিয়ে গেল। টহল বাহিনীর কমাণ্ডার ছিল আনতানুস! সে আবু ওয়াক্কাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কারা? কোত্থেকে আসছো?'

আবু ওয়াক্কাস তাকে জানালো, 'আমরা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। সুলতান আইয়ুবীর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য দামেশক থেকে এসেছি।'

আনতানুস তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করে যখন নিশ্চিত হলো আবু ওয়াক্কাস সত্যি কথাই বলছে, তখন বললো, 'কিন্তু তোমার বাহিনীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই দেখছি বেশী!'

'জ্বী, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরা সবাই মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর তত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ময়দানে যাচ্ছে। আহত সৈনিকদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সুলতান অনুমতি দিলে এরা সরাসরি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে।'

কমাণ্ডোদের দেখে অনেকেই তাদের কাছে গিয়ে জটলা করে ওদের কথা শুনতে লাগলো। যুদ্ধের খবর শোনার জন্য সবাই ছিল উদগ্রীব। তারা প্রশ্ন করলো, 'যুদ্ধের খবর কি?'

আনতানুস বললো, 'যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি। তবে কখন শুরু হয়ে যায় তা বলা যায় না।'

পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও এসে জড়ো হয়েছিল সৈনিকদের

পাশে। আনতানুস কথা বলতে বলতে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। তার দৃষ্টি আটকে গেল এক মেয়ের ওপর। সে একটু অবাক হয়েই বললো, 'ফাতেমা! তুমি কেমন করে এখানে?'

ফাতেমাও এমনটি ভাবেনি। সেও অবাক হয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল আনতানুসের দিকে। আনতানুস তার নাম উচ্চারণ করতেই ভিড় ঠেলে সে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তার হাত ধরে বললো, 'আনতানুস! তুমি এখানে!'

এই সে ফাতেমা, যাকে আনতানুস গুমাস্তগীনের মহল থেকে মুক্ত করেছিল। আবু ওয়াক্কাস তাদের পরিচয়ের কাহিনী শুনে বললো, 'আল্লাহ মেহেরবান! তিনি এভাবেই মুমীনের ইচ্ছা পূরণ করেন।'

এভাবেই আবু ওয়াক্কাস ও আনতানুসের অপরিচিতির ব্যবধান দূর হয়ে গেল। আবু ওয়াক্কাস আনতানুসকে বললো, 'আপনারা আমার মেহমান। ইফতারীর সময় ঘনিয়ে এসেছে, এখন আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। আপনারা সবাই আমাদের সাথে ইফতারী করবেন।'

আবু ওয়াক্কাসের নির্দেশে লোকজন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আনতানুস ও ফাতেমা দীর্ঘদিন পর একান্ত সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে অভিভুত হয়ে গেল।

একটু পরই দামেশক থেকে অনেক দূরে এ নির্জন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো আজানের পবিত্র ধ্বনি। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সাথে ইফতারে শামিল হলো আনতানুস ও তার সাথে আসা

অন্য এগারোজন কমাণ্ডো সৈনিক। ইফতারের পর জামাতের সাথে সালাতুল মাগরিব আদায় করলো সবাই। নামাজের পর খাওয়া দাওয়া শেষে সৈন্যরা যার যার তাবুতে ফিরে গেল। সারা দিনের বিরামহীন সফরের পর বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে অনেকেই তাবুতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো। কেউ কেউ মেতে উঠলো গল্প গুজবে। মেয়েরা তাদের তাবুর সামনে গোল হয়ে বসে গল্প গুজব ও গান শুরু করে দিলো। কমাণ্ডো দল স্বেচ্ছাসেবীদের তাবু থেকে একটু দূরে তাদের তাবু টানালো। আনতানুস তার দলকে বললো, 'তোমরা বিশ্রাম নাও, আমি একটু আবু ওয়াক্কাসের ওখানে যাচ্ছি।' আনতানুস বেরিয়ে গেল তাবু থেকে।

রাত আরেকটু গভীর হলো। ফাতেমা এক ফাঁকে গোপনে সরে পড়লো মেয়েদের জটলা থেকে। তাঁবুর বাইরে এসে সে ব্যাকুল হয়ে আনতানুসকে তালাশ করতে লাগল। আনতানুস মেয়েদের তাবু থেকে একটু দূরে এক বালিয়াড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন নিশ্চিত হলো মেয়েদের তাবু থেকে বেরিয়ে আসা মহিলা ফাতেমা ছাড়া আর কেউ নয়, আনতানুসও বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

আনতানুসের মনে পড়ছিল ফাতেমার সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের কথা। সে সময় আনতানুস ছিল সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা। হারানে গুমাস্তগীনের দূর্গে প্রবেশ করেছিল তথ্য সংগ্রহের জন্য। গুমাস্তগীনের অন্দর মহলের তথ্য সংগ্রহের জন্য তার দরকার ছিল অন্তপুরের কোন নারীর সাথে

যোগাযোগ। এ কাজে ব্যবহারের জন্যই সে ফাতেমার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে যায় প্রেমের রাজ্যে।

ফাতেমা ছিল হারানের শাসক গুমাস্তগীনের এক বেগম। তাকে গোয়েন্দা কাজে লাগাতে গিয়েই আনতানুস জড়িয়ে পড়েছিল বিপদে। ফাতেমা গুমাস্তগীনের এক খৃস্টান উপদেষ্টাকে হত্যা করে ফেলে। আনতানুস গ্রেফতার হয়েও ফাতেমাকে নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়েছিল সেনাপতি শামস বখতের সহায়তায়। সুলতান আইয়ুবী আনতানুসকে রেখে ফাতেমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দামেশকে। আনতানুসকে শামিল করে দিয়েছিলেন কমাণ্ডো বাহিনীতে। সেই থেকে ওদের মাঝে এই বিচ্ছিন্নতা। দীর্ঘদিন পরে তার সাথে ফাতেমার এই আকস্মিক দেখা।

আনতানুস এক সময় তীব্রভাবে অনুভব করতো, ফাতেমাকে ছাড়া তার জীবন একেবারেই অচল। এ মেয়ে তার অন্তরের গভীরে এমন আসন করে নিয়েছে, যেখান থেকে তাকে সরানো অসম্ভব। কিন্তু সুলতানের সাথে সাক্ষাতের পর সে প্রয়োজনের তীব্রতা কমে আসে। সে অনুভব করে, সবকিছুর আগে তার প্রয়োজন, গোয়েন্দা হিসেবে সাফল্য অর্জন। ফাতেমাকে আজ নতুন করে দেখার পর সে অনুভূতিতে আবার ফাটল ধরে। তার মনে হতে থাকে, ফাতেমাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন।

ফাতেমা আইয়ুবীর সামনে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছিল, 'আমি এ যুবকের জীবন সাথী হতে চাই।' আইয়ুবী তাকে আশ্বাস

দিয়েছিল, 'সময় আসুক, তোমার আশা পূরণ করা হবে।' এ আশ্বাসের কথা স্মরণ করেই বিচ্ছেদের দিনগুলো সে পার করছিল আনতানুসের স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে। আনতানুসকে আজ এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার আবেগের দরিয়ায় আবার অজানা স্রোতের ঢেউ উঠলো। ভালবাসার মধুর রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো মন।

তাদের এ সাক্ষাৎ হলো প্রচণ্ড আবেগময়। ক্ষণিকের জন্য ওরা উভয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। কিন্তু আনতানুস দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ফাতেমার বাহু বেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'ফাতেমা! এখনও আমাদের শাদীর ফরজ সম্পন্ন হয়নি। আবেগের বশে একবার আমরা শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছি। তার খেসারত আমাদের কম দিতে হয়নি। এ জন্য আমি সুলতান আইয়ুবীর সামনে বড়ই লজ্জিত। লজ্জিত আমার জাতির সামনেও!

তোমার সাথে দেখা হওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল। প্রথম দেখার সময় এ কথা কখনো ভাবিনি, তোমার সাথে এভাবে প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বো। কিন্তু কয়েকদিনের মেলামেশা এবং বিপদের মোকাবেলা করতে গিয়ে কখন যে আমাদের দু'টি হৃদয় এক হয়ে গেছে আমি তা টেরও পাইনি।

আমি কমাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম একটি নির্দিষ্ট ফরজ আদায়ের জন্য। সে ফরজ আজো আমার আদায় হয়নি। সম্মানিত সুলতান একবার আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন একটি কমাণ্ডো গ্রুপের।

তোমাকে আমি গভীর ভাবে ভালবাসি কিন্তু আগে আমাকে আমার ফরজ আদায় করতে দাও।'

'আমিও এক ফরজ আদায় করতেই বেরিয়েছি!' ফাতেমা বললো, 'আমি তোমাকে বলতে চাই, গুমাস্তগীনকে হত্যা করবে এক নারী! এবং সে নারী এখন তোমার সামনে!'

'অসম্ভব!' আনতানুস বললো, 'সম্মানিত সুলতান কখনোই মেয়েদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমার তো মনে হয়, তিনি তোমাদের সবাইকে ফেরত পাঠাবেন।'

'না, আমাকে তিনি ফেরাতে পারবেন না।' ফাতেমা তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললো, 'আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব, মেয়েরা শুধু অন্দর মহল ও গৃহ কোণে বন্দী থাকার জন্য জন্মায়নি, জিহাদের ময়দানেও তারা পুরুষের মতই সাহসী ভূমিকা রাখতে পারে।'

আনতানুস কিছু বলতে যাচ্ছিল, সহসা সে আনতানুসের হাত চেপে ধরে বললো, 'আনতানুস, আমার একটি আশা তুমি পূরণ করো! আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো। নারী নয়, আমি এক পুরুষের পোশাকেই তোমার সাথে পথ চলবো।'

'না।' আনতানুস দৃঢ়তার সাথে বললো, 'এমনটি কখনো হতে পারে না। তোমাকে আমার সঙ্গে রাখলে তোমাকে রক্ষা করার চিন্তাই আমার মন-মগজকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখবে। তাহলে আমি আমার ফরজ পালন করতে পারবো না।'

'না, আনতানুস, না। আমি কোন অবলা নারী নই। দুর্বল এবং ভীতুও নই। আমার স্বপ্ন ও সাহসের সাথে আজ একটু হলেও যুক্ত হয়েছে ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ। আমি কেবল আমাকে রক্ষা

করবো ভেবো না, প্রয়োজনে তোমাকেও সহায়তা করতে পারবো। বিশ্বাস করো, কখনো আমাকে তোমার বোঝা ভাবতে দেবো না।'

'না, তবু এমনটি সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ যদি কখনো জানতে পারে, আমি সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কর্তৃপক্ষের অগোচরে কোন মেয়েকে সঙ্গে রেখেছি, তবে সে অপরাধে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ফাঁসী না হলেও কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠের পথ আমি এড়াতে পারবো না। তোমার ও আমার অন্তর যতই পবিত্র হোক, আমাদের উদ্দেশ্য যতই সৎ ও মহত হোক, পৃথিবীর কোথাও আমরা এর যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবো না। ফাতেমা! যুদ্ধ কখনো শুধু মনের আবেগ দিয়ে হয় না। সৈনিক কখনো মনের খেয়াল খুশী মত চলতে পারে না। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। যেখানে যাচ্ছিলে, যাও। হয়তো সুলতান আইয়ুবী তোমাদেরকে আহতদের সেবার কাজে লাগাতে পারেন। আল্লাহর যদি মঞ্জুর হয়, আজ যেমন আমাদের দেখা হলো, তেমনি আবার আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন।'

'আনতানুস! এতদিন 'পর তোমার দেখা পেলাম। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। তুমি যে ময়দানে লড়াই করছো, আমিও সে ময়দানের পথ ধরেছি। হয়তো আল্লাহ আমাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এখন থেকে আমরা দু'জন একই সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটে যাবো লড়াইয়ের

ময়দানে। সে ময়দান থেকে আল্লাহর মঞ্জুর হলে আমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবো, আর নয়তো হাতে হাত ধরে একসাথে পান করবো শাহাদাতের পেয়ালা। আনতানুস! তুমি কি আমাকে বলতে পারো, আবার আদৌ আমাদের সাক্ষাৎ হবে? হলে সেটা কবে, কোথায়?'

আনতানুস কতক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল। তাৎক্ষণিক এর কোন জবাব দিতে পারল না। এক সময় মাথা তুলে ধীর কণ্ঠে বললো, 'ফাতেমা! তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেয়া বড়ই কঠিন। এক অনিশ্চিত জীবনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। হয়তো আবার আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে! আবার এমনও হতে পারে, আমাদের দু'জনের যখন সাক্ষাৎ হবে তখন একজন জীবিত, অন্যজন মৃত। ফাতেমা! একজন কমাণ্ডো কখনো নিজের ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না। কোন মানুষ যেমন বলতে পারে না কতক্ষণ সে বেঁচে আছে, তেমনি পারে না কোন কমাণ্ডোও। কিন্তু মানুষের একটি ঠিকানা থাকে, ভাল-মন্দ জানার একটি ব্যবস্থা থাকে। কমাণ্ডোদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। সে নিজেই জানে না, কখন কোথায় সে থাকবে। আর আমার মত যারা গোয়েন্দা কমাণ্ডো, তাদের অবস্থা আরো করুণ! গোয়েন্দাদের লাশেরও কোন হদিস থাকে না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, যদি বেঁচে থাকি, যুদ্ধ শেষে তুমি যেখানেই থাকো, আমি খুঁজে বের করে নেবো। আর কিছু নয়, যুদ্ধ শেষে তোমার সাথে দেখা করাই হবে আমার প্রথম এবং একমাত্র কাজ।'

'এমনও তো হতে পারে, তুমি আহত হয়ে ফিরে আসবে ক্যাম্পে। আর তোমার ব্যাণ্ডেজে মলম লাগিয়ে দেয়া ও সেবা করার জন্য যে মানুষটিকে আল্লাহ মনোনীত করবেন, সে মানুষটি আমি?' বললো ফাতেমা।

আনতানুস পরিবেশকে একটু হালকা করার জন্য বললো, 'এমনটি কল্পনা করতে দোষ কি! তবে গোয়েন্দা কমাণ্ডোদের মলম-পট্টি সাধারণত শত্রুরাই করে থাকে।' তারপর একটু বিরতি দিয়ে বললো, 'ফাতেমা! বেশী আবেগপ্রবণ হয়ো না। মুজাহিদদের শুধু জীবনই কুরবানী দিতে হয় না, আবেগ এবং আশাকেও কুরবানী দিতে হয়। যদি তুমি চাও, তোমার মত মেয়েরা আর ধনী ও আমীরদের হেরেমের সৌন্দর্য সামগ্রী হবে না, খৃস্টানদের পশুত্ব ও বর্বরতা থেকে নিরাপদে থাকবে তারা, তবে আপাতত ব্যক্তিগত ভালবাসার চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। দূর করে দাও ব্যক্তিগত ক্রোধ ও রাগ। গুমাস্তগীনকে হত্যা করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, এমন চিন্তাও মুছে ফেলো মন থেকে। তোমার চিন্তা থাকবে শুধু একটি, যুদ্ধের মাঠে যে দায়িত্ব পাবে, সে দায়িত্ব পালন করতে হবে নিষ্ঠার সাথে। কেবল সে দায়িত্বের কথাই শুধু মনে থাকবে তোমার, আর কিছু নয়।'

একটু পর। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একে অন্যকে বিদায় জানালো ওরা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে গেল নিজ নিজ তাবুর দিকে। আনতানুস যতই উপদেশ খয়রাত করুক, সে নিজে যেমন ফাতেমাকে ভুলতে পারল না, তেমনি ফাতেমাও ভুলে

যেতে পারল না আনতানুসের প্রতি তার ভালবাসার কথা। এমনকি আনতানুসের উপদেশের পরও মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারল না গুমাস্তগীনকে খুন করার সেই অদম্য নেশাও।

০

সুলতান আইয়ুবীর সময় কাটছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রের নকশা দেখে। কখনো তিনি নকশার রেখাগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। কখনো অশ্বারোহী সৈন্যদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও মহড়া দেখতেন। কখনো নকশায় নতুন করে দাগ দিতেন। তিনি তাঁর মেধা ও বুদ্ধির সব শক্তি নিয়োজিত রেখেছিলেন যুদ্ধের পরিকল্পনাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণতা দান করতে।
তিনি মূল যুদ্ধ পার্বত্য উপত্যকা ও তৎসংলগ্ন সমতল ভূমিতে চালানোর পরিকল্পনায় অটল রইলেন। পরিকল্পনার ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, বাম দিকের উঁচু প্রান্তর ও তার পিছনের পর্বতশ্রেণী মাড়িয়ে শত্রুর এগিয়ে আসার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কিন্তু ডান দিকের পার্বত্য টিলা তেমন দুর্গম ছিল না। টিলার পেছনের খোলা ময়দানে শত্রুসেনারা জমায়েত হলে এ পার্বত্য টিলা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে তেমন দুঃসাধ্য নয়। দুশমন এদিক দিয়ে আক্রমণ করলে সুলতান আইয়ুবীর প্ল্যান হুমকীর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা আছে। তাঁর কাছে এত অধিক সৈন্য নেই যে, তিনি সেদিকে সৈন্যদের প্রাচীর দাঁড় করাতে পারেন। অবশ্য

এদিকের টিলার আড়ালে তিনি তীরন্দাজদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে মোতায়েন রেখেছেন! কিন্তু এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এখানে যুদ্ধ করার জন্য তিনি দু'টি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে তাদের ময়দানে আসার অনুমতি ছিল না। এ বিষয়টি সুলতান আইয়ুবীকে ভাবিয়ে তুললো। তিনি তাঁর সঙ্গের বাহিনীকে ডান দিকে আরেকটু এগিয়ে নেবেন কিনা এটা দেখার জন্য এক উঁচু টিলার ওপর চড়ে সেদিকে তাকালেন। সহসা দূর দিগন্তে তিনি দেখতে পেলেন ধূলি ঝড়। এমন ধূলি মেঘের সাথে সৈন্যরা ভালমতই পরিচিত। ধূলির এ মেঘ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, ওদিক দিয়ে ছুটে আসছে কোন অশ্বারোহী বাহিনী। একটু পরেই ঘোড়া চোখে পড়লো তাঁর। ধূলি মেঘের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, অশ্বারোহীরা এক লাইনে নয়, বরং পাঁচটি লাইন ধরে এগিয়ে আসছে। বাহিনী ছোট নয়, অন্তত চার-পাঁচশ অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী।

এরা শত্রু ছাড়া আর কে হতে পারে? সুলতান আইয়ুবী গর্জন করে বললেন, 'কেন, এ রাস্তায় প্রহরী, কমাণ্ডো বা গোয়েন্দাদের কেউ কি ছিল না? এত বড় বাহিনী এগিয়ে আসছে, এদের কেউ বাঁধাও দেয়নি, কোন খবরও দেয়নি, এটা কেমন করে হলো?'

তিনি দ্রুত টিলা থেকে নেমে এলেন এবং বাহিনীকে বললেন 'তোমরা জলদি তৈরি হও! মুজাহিদ, মনে রেখো, অনাকাঙ্খিত

পরিস্থিতি থেকে বিজয় ছিনিয়ে নেয়াই বাহাদুর সৈনিকের কাজ!'
যুদ্ধের নাকারা বেজে উঠলো। নাকারা বাজার সাথে সাথে সমস্ত সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে গেল। সুলতান আবার ছুটে গেলেন সেই টিলার ওপর। তারপর ছুটে আসা বাহিনীর দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে অনড় দাঁড়িয়ে রইলেন।
কিছুক্ষণ পর। ঘোড়া আরো নিকটতর হলো। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অশ্বারোহীদের। তাদের চলার ভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়। সহজ সচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে আসছে কাফেলা। সুলতান একটু অবাক হলেন। সঙ্গের এক কমাণ্ডারকে আদেশ দিলেন, 'কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে সামনে দৌড়াও। দেখো এরা কারা?'
চারজন অশ্বারোহী নিয়ে ছুটলো কমাণ্ডার। একটু পর ফিরে এলো বাহিনীর আগে আগে। দূর থেকেই চিৎকার করে ওরা বলছিল, 'এরা দামেশক থেকে এসেছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাদের সাথে নারী ফৌজও আছে।'
'কি! নারী ফৌজ!' সুলতান আইয়ুবী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মেয়েদের সেনা দল?'
'জ্বি, চারশ নারী ও একশ পুরুষ আছে এ বাহিনীতে।'
তিনি আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, 'বুঝেছি, এ বাহিনী আমার বিধবা বোন পাঠিয়েছেন। ওস্তাদ জঙ্গীর বিধবা পত্নী আবারো প্রমাণ করলেন, তিনি মরহুমের উপযুক্ত সহধর্মিনী ছিলেন। যে জাতি এমন মায়েদের স্নেহ ও সেবা পায়, সে জাতির সন্তানদের চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে আছে?'

সুলতান আইয়ুবীর চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উৎফুল্ল কণ্ঠে হাসতে হাসতে তিনি পাশে দাঁড়ানো সেনাপতিদের বললেন, 'এ জাতির মেয়েরা দেখছি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে বিজয়ী করেই ছাড়বে।'

'আমরা এতে অপমানিত নই, বরং সম্মানিত বোধ করছি সুলতান। পুলকিত বোধ করছি এ জন্য যে, জেহাদের প্রেরণা জাতির প্রতিটি হৃদয়কে আলোকিত করে তুলেছে। জেহাদ করার দায়িত্ব গুটিকয় সৈনিকের নয়, সমগ্র জাতির। জাতি এখন সে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। আর এ সত্যের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ময়দানে নেমে এসেছে অন্তপুরবাসী মায়েরা ও মেয়েরা। তবে ওদের কষ্ট করতে হবে না, আপনি এ বোনদের আশ্বস্ত করতে পারেন, তোমাদের ভাইদের শিরার খুন এখনও নিঃশেষ হয়নি, ইনশাআল্লাহ তাদের খুনই তোমাদের মান-সম্ভ্রম ও বিজয়ের জামিনদার। এ জাতির একটি মেয়েও শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হলে আমরা মরেও শান্তি পাব না।'

সুলতান আইয়ুবী উপত্যকা থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হলেন। মেয়ে ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত বাহিনী ক্রমশ এগিয়ে তার কাছে এসে থেমে গেলো। এ বাহিনীর কমাণ্ডার আবু ওয়াক্কাস ঘোড়া থেকে নেমে সুলতান আইয়ুবীর সামনে এসে যথারীতি সালাম দিয়ে নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর লিখিত চিঠি পেশ করলেন।

চিঠি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন আইয়ুবী। তাতে লিখা ছিল:

'প্রিয় ভাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! আল্লাহ তোমার ও তোমার বাহিনীর সকলকে মদদ দান করুন। যদি আমার স্বামী বেঁচে থাকতেন, তবে বিশাল শত্রুর মোকাবেলায় নিশ্চয়ই এত অল্প সৈন্য নিয়ে তোমাকে ময়দানে এগিয়ে যেতে হতো না। তোমার সাহায্যে অবশ্যই তিনি সেনা সাহায্য পাঠাতেন। আমি তোমাকে তেমন কোন সাহায্য পাঠাতে পারছি না। তবে তোমার শান্তনার জন্য বলি, এখানে আমি বসে নেই। এ মুহূর্তে আমার দ্বারা যতটুক সম্ভব হলো তা পাঠিয়ে দিলাম। এ মেয়েদেরকে আমি আহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরানো ও তাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ওদের সাথে ঔষধ এবং ব্যাণ্ডেজের সব সামগ্রীও পাঠিয়েছি। ওদের সাথে রয়েছে একশ স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ সেনা। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা ওদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এরা সকলেই রাতের অতর্কিত আক্রমণের ট্রেনিং পেয়েছে। এদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোন অভাব নেই। তবে একটু বেশী আবেগপ্রবণ।

আমি জানি, তুমি মেয়েদেরকে যুদ্ধের ময়দানে রাখতে মোটেই পছন্দ করবে না। আমি তোমার এ মনোভাব জানার পরও বলছি, যদি এদের তুমি দামেশকে ফেরত পাঠাও, তবে দামেশকের জনসাধারণ খুবই কষ্ট পাবে। তাদের উৎসাহ ও মনোবল ভেঙ্গে যাবে। তুমি জানো না, দামেশকে এখন মানুষের মনে কি প্রচণ্ড জযবা বিরাজ করছে। সমস্ত পুরুষরাই এখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। মেয়েরাও তোমার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে আগ্রহী। এ বাহিনীকে শহরের সর্বস্তরের জনতা

তাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এখানে এখন শিশুরাও যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। এ চেতনা অটুট থাকলে জেহাদের ময়দানে তোমার সৈন্যের কোন ঘাটতি হবে না ইনশাআল্লাহ।'

ইতি তোমার বিধবা বোন।

চিঠি পড়ে সুলতান আইয়ুবী আবেগে অভিভুত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ ভরে উঠল আনন্দাশ্রুতে। তিনি মেয়েদের দিকে ফিরে তাকালেন। অশ্বপৃষ্ঠে তাদেরকে দেখাচ্ছিল বীর যোদ্ধার মত। সুলতান আইয়ুবীর আদেশে মেয়েরা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। দেশ ও জাতির খেদমতে তোমরা যে আবেগ ও প্রেরণা নিয়ে এসেছো, তার মূল্য আমি দিতে পারবো না, তার প্রতিদান আল্লাহই তোমাদের দেবেন। আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি, মেয়েদেরকে আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহ্বান জানাবো। আমার বড় সংকোচ ও লজ্জা হয়, ইতিহাস হয়ত বলবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নারী সমাজকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তোমাদের আশাকে আহত করবো না। তবে রণাঙ্গণে রাখার আগে আমি তোমাদের সুযোগ দিচ্ছি, তোমরা আবারো চিন্তা করো, যারা এখানে আবেগের বশে চলে এসেছো, তারা পৃথক হয়ে যাও নিজ নিজ সারি থেকে। আর তারাও সরে দাঁড়াও, যাদের মনে সামান্যতম ভয় এবং দ্বিধা রয়ে গেছে।'

কিন্তু একটি মেয়েও সারি থেকে সরে দাঁড়ালো না। সুলতান আইয়ুবী তখন তাদেরকে বললেন, 'যদি তোমরা যুদ্ধই করতে চাও, তবে শুনে নাও যুদ্ধের নিয়ম। নেতার নির্দেশের বাইরে কেউ এক পা-ও এগুবে না। নির্দেশ পেলে কেউ তা পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও করবে না। কোন নির্দেশ তোমার পছন্দ হোক আর না হোক, বিনা প্রশ্নে তা মান্য করবে। এবার যুদ্ধে তোমাদের অবস্থান জেনে নাও। আমি তোমাদেরকে তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছি। যুদ্ধের সময় পুরুষদের অতিক্রম করে কেউ সামনে যাবে না। এবার যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করছি। যুদ্ধের সময় এ অঞ্চল শত্রুর কবলে পড়তে পারে। হয়ত তীরের আঘাতে তোমরা কেউ মারা যেতে পারো। এমনও হতে পারে, শত্রুর হাতে তোমরা লাঞ্ছিত হবে। লড়াইতে শরীক হওয়ার আগে তোমাদের জানা দরকার, বর্শা ও তলোয়ারের আঘাত বড় কঠিন ও বেদনাদায়ক। এবার বলো, কে কে এ যুদ্ধে অংশ নিতে চাও।'

একটি মেয়ে হাত উপরে তুলে উচ্চ স্বরে বললো, 'আপনি ইতিহাসের কথা বলেছেন। আমরাও ইতিহাসকে ভয় পাই। যদি আমরা আজ এখান থেকে ফিরে যাই, ইতিহাস বলবে, জাতির কন্যারা তাদের নেতা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে রণাঙ্গণে ফেলে রেখে নিজেরা ভয়ে ঘরের কোণে ফিরে গিয়েছিল। এ অপবাদ আমরা কেউ মাথা পেতে নিতে পারি না।'

অন্য এক মেয়ে বললো, 'আল্লাহ সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহুতে অনেক শক্তি দান করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে তিনি

পঙ্গু করে পাঠাননি যে, জাতির দুর্দিনে আমরা শুধু গৃহকোণে বসে অশ্রু বিসর্জন করবো।'

আরেক মেয়ে কিছু বলার জন্য হাত তুলল। সুলতান বললেন. 'বলো, তুমি কি বলতে চাও।'

'মাননীয় সুলতান! তিন মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি। আমি আপনাকে বলতে চাই, আমাকে যুদ্ধের সুযোগ না দিলে আমি আর কোনদিন আমার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবো না।'

'তোমার স্বামী নিজে যুদ্ধে না এসে তোমাকে পাঠাল কেন?' সুলতান আইয়ুবী প্রশ্ন করলেন, 'সে কেমন স্বামী, যে তার নববধূকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল?'

'সুলতান! সে তো অনেক আগেই আপনার বাহিনীতে শামিল হয়ে আছে!' মেয়েটি উত্তর দিল।

এ মেয়ে থামতেই সমস্ত মেয়ে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল, 'সুলতান! আপনি আমাদের সুযোগ দিন। আমরা আপনাকে নিরাশ করবো না।'

সুলতান হাত তুলে ওদের থামতে ইশারা করলেন। থেমে গেল মেয়েদের কলরব। সুলতান বললেন, 'যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে পুরুষদের আগে এগিয়ে দেবো, এমন চিন্তা কারো থাকলে সে কথা ভুলে যাও। তোমাদের জন্য ছোট ছোট গ্রুপ করে দিচ্ছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রুপ লিডারের নির্দেশ মত চলবে। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। তোমাদের কারো বিরুদ্ধে যেন শৃঙ্খলা ভঙ্গের

অভিযোগ শুনতে না হয়।'

তিনি সে দিনই মেয়েদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেক গ্রুপের সাথে দিলেন দু'জন করে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক। এসব স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই ছিল সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তাদেরকে যথারীতি আহতদের সেবা কাজে নিয়োগ করলেন। কারণ তারা সামরিক প্রশিক্ষণ পেলেও নিয়মিত সৈনিক ছিল না।

মেয়েদের ক্যাম্প পুরুষদের তাবু থেকে দূরে পর্বতের এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করা হলো। যারা আহতদের রণাঙ্গণ থেকে সরিয়ে আনা ও চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের জায়গায় নিয়োগ দেয়া হলো এ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে, আর ওদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হলো মূল সেনাবাহিনীতে। এসব স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক ও মেয়েদের আরও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ সালারকে দায়িত্ব দিলেন সুলতান।

০

ফাতেমা, মানসুরা, হুমায়রা ও সাহারা একই গ্রুপে পড়ল। তাদের এই এক গ্রুপে পড়া ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। তাদের পরস্পরের মধ্যে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল গভীর সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। তারা একসাথে দামেশকে পৌছে ছিল এবং একসাথেই ট্রেনিংও নিয়েছিল। জেহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে ওদের মধ্যে কাজ করছিল একই রকম চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাংখা। তাদের সাথে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যারা পড়ল

তাদের একজনের নাম ছিল আজাদ বিন আব্বাস। দেখতে খুবই সুপুরুষ ও নওজোয়ান। মেয়েদের বড় তাবুর দু'পাশে ছোট্ট দুই আলাদা তাবুতে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীদের থাকার ব্যবস্থা হলো। উদ্দেশ্য, মেয়েদের কিছু লাগলে যেন দ্রুত তা জানাতে পারে এবং একজন কোন কাজে দূরে গেলে অন্যজন যেন পাহারায় থাকতে পারে মেয়েদের বড় তাঁবুর। এই মেয়েদের মধ্যে খতিবের মেয়ে মানসুরা শারীরিক দিক থেকে ছিল যেমন নিখুঁত, তেমনি ছিল হুশিয়ার ও অসম্ভব বুদ্ধিমতি।

বিকেল বেলা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। মনসুরা দেখলো, তাদের সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবক আজাদ বিন আব্বাস এক পাহাড়ী টিলায় উঠে দ্রুত সরে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে। সে যাচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে, কেউ তাকে দেখতে পেলো কিনা! আজাদের এ সতর্কতা দৃষ্টি এড়াল না মানসুরার। তার মনে খটকা লাগলো। সন্দেহ হলো, সে এমন কিছু করছে যা অন্যকে দেখতে দিতে চায় না।

মানসুরা পিছু নিল তার। একটু পর সেও টিলার উপরে চলে এলো। দেখলো আজাদ তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আজাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও সেদিকে দৃষ্টি ফেললো। সামনে পাহাড়ের ঢালুতে দেখা যাচ্ছে অনেক সৈন্য। আজাদ মানসুরার উপস্থিতি টের পেয়ে তার দিকে ফিরে মিষ্টি করে হাসল। বললো, 'তাকিয়ে দেখো, আমাদের মূল ফৌজ। চলো, আরেকটু এগিয়ে আরো কাছ থেকে তাদের দেখে আসি।'

সে হাঁটা ধরলে মানসুরাও তার সাথে চলতে লাগল। আজাদ গল্প জুড়ে দিল মানসুরার সাথে। আজাদ যেমন সুদর্শন ছিল, তেমনি ছিল বাকপটু। কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করায় ওস্তাদ। তার প্রাণ চাঞ্চল্য ও আবেগঘন কথায় বেশ পুলক অনুভব করল মানসুরা। সেও মজে গেল কথামালার রাজ্যে। আজাদ এখানকার পাহাড়ী এলাকা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

সে মানসুরার সাথে দীলখোলা আলাপ করতে করতে বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল, মানসুরা বলল, 'চলো ফিরে যাই।'

ফিরতি পথ ধরলো ওরা। আজাদের মুখে তখন কথার খই ফুটছে। মানসুরা যত তার কথা শুনছে, ততই মুগ্ধ ও তার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। সূর্য ডোবার সময় তারা তাঁবুতে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে আজাদ মানসুরার মন জয় করে নিয়েছে।

ইফতারীর পর মেয়েরা তাদের তাঁবুতে খানা খাচ্ছিল। একজন সেনা কমাণ্ডার তাঁবুর পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলো, কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। মেয়েরা জানাল, তারা সবাই শান্তি ও নিরাপদে আছে। কমাণ্ডার সরে গেল সেখান থেকে। আজাদ তাবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে কমাণ্ডারকে সরে যেতে দেখে এগিয়ে গেল তার দিকে, তারপর তার সাথে আলাপ জুড়ে দিল। অনেকক্ষণ তারা তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললো। মানসুরা কান খাঁড়া করে ওদের কথা মনযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছিল। আজাদ

কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলো, ‘এত অল্প সৈন্য নিয়ে বিশাল তিনটি বাহিনীর সাথে কেমন করে আমরা মোকাবেলা করবো?’

‘এ নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। শত্রুদের জন্য ফাঁদ তৈরি করা আছে।’ কমাণ্ডার বললো, ‘যুদ্ধ শত্রুরা যেখানে আশা করছে সেখানে হবে না। আমরা তাদেরকে সেখানে টেনে নিয়ে আসব, যেখানে তাদের জন্য আমরা ফাঁদ তৈরী করে রেখেছি।’ কমাণ্ডার আজাদের কথার ফাঁদে পড়ে সুলতান আইয়ুবীর সমস্ত প্ল্যানের কথা বলে দিল তাকে। তারা কিভাবে সৈন্য ভাগ করেছে, কিভাবে ফাঁদ পেতেছে সবই অবলীলায় ফাঁস করে দিল তার কাছে।

তাদের আলোচনা শুনে মানসুরার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল! আজাদকে দুশমনের গোয়েন্দা ভাবতে কষ্ট হলো তার, কিন্তু তার উদ্দেশ্য যে ভাল নয়, এটা সে ঠিকই বুঝতে পারল।

সে রাতেরই ঘটনা। রাত তখন দ্বি-প্রহর! ঘুমিয়ে পড়েছিল মানুসরা, কিন্তু কিভাবে যেন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়ে গেল আজাদের কথা। হঠাৎ আজাদের তাঁবু থেকে অস্ফুট স্বরে কথার বলার শব্দ ভেসে এলো তার কানে। মানসুরা সম্পূর্ণ সতর্ক ও উৎকর্ণ হয়ে বিছানায় বসে পড়ল। সে শুনতে পেলো, কেউ বলছে, ‘তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। যথেষ্ট তথ্য তুমি জেনেছ। আর আমিও যা জানি সব বলে দিয়েছি। আমার পক্ষে এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। ভালই হলো, তুমি এসে গেছ। এখন জলদি কেটে পড়ো। তুমি পালিয়ে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না,

সবাই ভাববে, ভয় পেয়ে পালিয়েছো তুমি।'

'ঠিক বলেছো তুমি।'

লোকটি আজাদকে কোন রাস্তা ধরে পালাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললো, 'তোমাকে এখান থেকে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তারপরও ভোর হওয়ার আগেই তুমি সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে। একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছার চেষ্টা করো। হয়ত এমনও হতে পারে, ওরা আগামী কালই এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালাতে পারে। এখানে ফাঁদ পাতা আছে, মজবুত ফাঁদ। তারা যেন কোন অবস্থাতেই পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে না আসে। খোদা হাফেজ!'

লোকটির চলে যাওয়ার পদধ্বনি শুনতে পেল মানসুরা। লোকটি চলে যেতেই মানসুরা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলো। দেখলো, আজাদ তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর আজাদ তাবুর মধ্যে ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাইরে বেরিয়ে এসে একদিকে হাঁটা ধরলো। সে যাত্রা শুরু করতেই তাঁবুর অন্য মেয়েদের না জাগিয়ে মানসুরা তার বিছানার তলা থেকে খঞ্জর বের করে সঙ্গে সঙ্গে তাবুর বাইরে বেরিয়ে এল এবং সন্তর্পনে তার পিছু নিল।

০

আকাশে হালকা মেঘ। সে কারণে চাঁদের আলো অস্পষ্ট। মানসুরা আজাদের অস্পষ্ট অবয়বকে অবলম্বন করে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলতে লাগলো। আজাদ

পাহাড়ের একটি ছোট টিলা পার হয়ে এক উপত্যকায় নেমে গেল। মানুসরাও তাকে অনুসরণ করে নেমে এল সেই উপত্যকায়।

পথে কোন প্রহরী চোখে পড়ল না মানসুরার। এতে মানসুরা বুঝে গেল, যে ব্যক্তি আজাদের কাছে এসেছিল সে তাকে এমন পথ বলে দিয়েছে, যাতে সে সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যেতে পারে। মানসুরা কোন ডিউটিরত সৈনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তার জানা ছিল না, এ পথে কোথায় সৈন্য আছে, বা আদৌ আছে কিনা? সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল, যদি কোন টহল গ্রুপের সাক্ষাত পেতো, তবু এর একটি সুরাহা সে করতে পারতো। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাকে নিরাশ হতে হলো।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো ওরা। আগে আজাদ, পেছনে মানসুরা। আরেকটু এগিয়ে এক সংকীর্ণ গিরিপথ ধরলো আজাদ। মানসুরা একটু থমকে দাঁড়াল। গিরিপথে প্রবেশ করবে কিনা ভাবল মুহূর্তকাল, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে সেও ঢুকে পড়ল সেই সংকীর্ণ পথে।

গিরিপথটি বেশী বড় ছিল না। অল্প সময়েই ওরা পেরিয়ে এল গিরিপথ।

সামনে খোলা প্রান্তর। সে প্রান্তরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় নানা আকারের গাছ। গাছের নিচে ঘন অন্ধকার।

আজাদ একটি গাছের আড়ালে অন্ধকারে গিয়ে-থেমে গেল।

মানসুরা চট করে লুকিয়ে পড়ল এক ঝোপের আড়ালে। আজাদ ডানে-বামে এবং পেছনে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা! কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন সে নিশ্চিত হলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, তখন সে আবার চলতে শুরু করল। এভাবে একটু পর পরই গাছের আড়ালে গিয়ে আজাদ থেমে যেতো এবং পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতো কেউ তাকে দেখছে কিনা। মানসুরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সাবধানে তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগলো।

মেয়েদের তাবু থেকে অনেক দূর চলে এসেছিল ওরা। সামনে আরেকটি পার্বত্য গিরিপথ। আজাদ সে গিরিপথে প্রবেশ করল। পেছন পেছন ঢুকল মানসুরাও। প্রচণ্ড শীত। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সেই সাথে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে হচ্ছে তুষারপাত।

মানসুরার ঠাণ্ডা পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। শরীরও কাঁপতে লাগলো শীতে। হঠাৎ কোন পাথরে হোঁচট খেল মানসুরা। আওয়াজ পেয়ে চট করে পেছনে তাকালো আজাদ। থমকে দাঁড়িয়ে কোথায় আওয়াজ হলো বুঝতে চেষ্টা করলো। মানসুরা বড় এক পাথরের আড়ালে বসে পড়লো। সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে আজাদ আবার চলতে শুরু করলো। আজাদ বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেলে মানসুরা উঠে আবার তার পিছু-নিল।

গিরিপথ থেকে ওরা খোলামেলা এক উপত্যকায় বেরিয়ে

এলো। উপত্যকাটি সবুজ ও সমতল। মসৃন মাটিতে পা পড়তেই আজাদ দ্রুত পা চালালো। মানসুরা তার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু সে তো এক নারী। প্রচণ্ড শীত আর এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় দীর্ঘ পথ হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আবেগের বশে সে আজাদের পিছু ধাওয়া করেছিল, কিন্তু কিভাবে তার গতি রোধ করা যাবে, এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, তখন সে চিন্তা তার মাথায় আসেনি। এখন যদি আজাদ দৌড় দেয় তবে সে তাকে আর অনুসরণ করতে পারবে না।

সে সন্দেহের বশে নয় বরং আজাদ শত্রুদের খবর দিতে যাচ্ছে এটা নিশ্চিত হয়েই তার পিছু নিয়েছিল। আশা ছিল, পথে কোন প্রহরীর সাহায্য পাবে। এখন সে আশা আর নেই। কি করে আজাদকে বাঁধা দেবে ভাবতে লাগল মানসুরা। চিন্তা করে দেখল, তাকে যদি ধরতে হয় তবে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। মানসুরার সঙ্গে ধারালো খঞ্জর আছে। মুশালে থাকতে সে বাবার কাছে খঞ্জর ও তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণও নিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল শুধুমাত্র ট্রেনিং। শত্রুর সাথে কোন দিন তার মোকাবেলা হয়নি। এখন এই স্বাস্থ্যবান এক সুপুরুষ কমাণ্ডো সৈনিককে মানসুরা কিভাবে কাবু করবে? মোকাবেলা করতে গেলে যে নিজেরই ধরাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী!

এসব চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল মানসুরা। আজাদ সহসা থেমে গেল এবং পিছন ফিরে তাকালো। মানসুরা

এবারও দ্রুত এক গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে সমর্থ হলো। গাছের গোড়ায় অজস্র পাথর। মানসুরার পায়ের চাপে হঠাৎ সে পাথর পিছলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল মানসুরা। রাতের নিস্তব্ধতায় সে পতনের শব্দ বেশ জোরালো হয়ে বাজল আজাদের কানে। আজাদ শব্দের উৎসের দিকে তাকালো। মানসুরা মাটিতে পড়ে ছিল, সুতরাং এবারও তাকে দেখতে পেলো না আজাদ। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে আর এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না আজাদ। সে গাছের দিকে এগিয়ে এলো। মানসুরা মাটিতে শুয়ে থেকেই দেখতে পেলো আজাদ এগিয়ে আসছে। সে শক্ত হাতে খঞ্জর চেপে ধরে চুপচাপ সেভাবেই পড়ে রইল।

আজাদ গাছের কাছে এসে গেল। মানসুরা দেখলো, তার হাতে খোলা তলোয়ার। আজাদ তার পাশ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল, মানসুরা সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার পা জড়িয়ে ধরে জোরে টান দিল। আজাদ মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চোখের পলকে মানসুরা তার পিঠের ওপর চড়ে বসে খঞ্জরের তিক্ষ্ণ মাথা তার ঘাড়ে চেপে ধরল।

আজাদ তখনো জানে না কে তাকে আক্রমণ করেছে। সে শুধু অনুভব করলো, তার ঘাড়ের ওপর চেপে আছে ধারালো খঞ্জর। একটু নড়লেই তা ঢুকে যাবে তার শাহরগ ভেদ করে। তার তলোয়ার হাতের মুঠো থেকে ছিটকে দূরে কোথায় পড়ে আছে সে জানে না। আজাদ বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করলো না। চুপচাপ শুয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

'তোমার যম। যার হাত থেকে তুমি জীবন নিয়ে পালাতে পারবে না।'

মানসুরার উত্তর শুনে আশার বিদ্যুৎ খেলে গেল তার মনে। বলল, 'ও, তুমি এক নারী?'

'হ্যাঁ! তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনেই তা বুঝতে পেরেছ।' মানসুরা বললো, 'আর তুমি আমাকে ভাল করেই চেনো। আমি মানসুরা।'

'ওরে ও পাগলী মেয়ে!' আজাদ একটু সাহস পেয়ে হেসে বললো, 'তুমি একি খেল শুরু করেছো? আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। সরো, উঠতে দাও। তোমার খঞ্জর আমার চামড়ায় বিঁধে যাচ্ছে, ওটা সরাও জলদি।'

'এটা কোন খেল তামাশা নয়। আগে বলো তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আল্লাহর কসম! আমি কোন মেয়ের পিছনে যাচ্ছি না।' আজাদ কৌতুকের স্বরে বললো, 'তোমার চেয়ে সুন্দরী কি আর আছে? সত্যি বলছি, তোমাকে দেখার পর সব মেয়েই আমার কাছে কুৎসিত হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে প্রতারণা করিনি।'

'আমাকে নয়, তুমি আমার জাতির সঙ্গে প্রতারণা করতে যাচ্ছো। সত্যি করে বল তো, তুমি আমার জাতির সাথে গাদ্দারী করতে যাচ্ছিলে না!' একটু দম নিল মানসুরা। তারপর গাঢ়স্বরে বললো, 'তুমি আমাকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মনে করতে, আমিও তোমাকে সুন্দর সুপুরুষ ভেবেছিলাম। কিন্তু

এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। এখন আমিও তোমার জন্য ভাল নই! আর তুমিও আমার কাছে ভাল মানুষ নেই। তুমি আমার স্বপ্ন ও আশাকে ধূলিস্মাৎ করতে তাবুর আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছো। হয়তো এটাই তোমার দায়িত্ব। তুমি যেমন তোমার কর্তব্য পালন করছো, আমি তেমনি আমার ফরজ পালন করছি। তুমি যদি আমার স্বামী হতে, আমার সন্তানদের বাবা হতে, তবুও আমার খঞ্জর তোমার গর্দান থেকে সরানোর কথা ভাবতাম না আমি।'

'তুমি আমাকে কি মনে করে হত্যা করতে চাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো আজাদ।

'কিছু মনে করে নয়। সন্দেহের বশে আমি তোমার পিছু নেইনি। তুমি মুসলিম নামের কলঙ্ক। তুমি খৃস্টান ও তাদের দোসর মুসলমানদের গোয়েন্দা।' মানুসরা বললো, 'আমি জানি, তুমি তোমার বন্ধুদেরকে সাবধান করতে যাচ্ছিলে। তাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলে ইসলামী লশকরের গোপন তথ্য। বলতে যাচ্ছিলে, সাবধান! তোমরা আইয়ুবীর ফাঁদে পা দিও না। তাকে আক্রমণ করতে এসে তোমরা পর্বত-শৃঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়ো না। ওখানে আইয়ুবী তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর ফাঁদ পেতে রেখেছে।'

'গেঁয়ো মেয়ের মত কথা বলো না তো! গোয়েন্দা কাকে বলে তুমি জানো? আমি তো শত্রুদের অবস্থান দেখতে যাচ্ছিলাম, যাতে যুদ্ধের সময় আমরা সহজে তাদের ওপর চড়াও হতে পারি!'

'আমি খুব ভাল করেই জানি, গোয়েন্দা কাকে বলে।' মানসুরা বললো, 'আমি এক জাদরেল গোয়েন্দার কন্যা। ইবনুল মাখদুম কাকবুরীর নাম কি কখনও শুনেছো? তিনি মুশালের মসজিদের খতিব ছিলেন। আমি তার কন্যা শুধু নই, তার দলের এক বিশ্বস্ত গোয়েন্দাও। আমি আমার বাবাকে কারাগারের গোপন কক্ষ থেকে উদ্ধার করে মুশাল থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি তো একদম আনাড়ী গোয়েন্দা! অভিজ্ঞ গোয়েন্দা কখনো কারো তাঁবুর পাশ দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলে না।'

'মানসুরা, আমার পিঠের ওপর থেকে নামো। আগে খঞ্জর সরাও, আমাকে কথা বলতে দাও। তুমি তো এখনও আসল কথাই শোননি। আমি কি জরুরী কথা বলি, আগে শোন।'

'তোমার মুখ তো খোলাই আছে!' মানসুরা বললো, 'বলো, তোমার জরুরী কথা বলো, আমি মনোযোগ দিয়েই শুনবো।'

আজাদ মানসুরার এ কথায় হতাশ হয়ে পড়ল। সে কি বলবে, কি করবে বুঝতে পারল না। কোন নারী এতটা দৃঢ়তার পরিচয় দেবে ভাবতে পারেনি সে। সে আর কোন কথা বললো না। তার শরীর অসাড় হয়ে পড়লো। সে আশাভঙ্গের বেদনায় নিজেকে মাটিতে এলিয়ে দিল।

মানসুরার সামনে এখন একটাই প্রশ্ন, কেমন করে তাকে বাঁধবে, কেমন করে সঙ্গে নিয়ে যাবে তাকে। যদি তাকে হত্যা করার প্রশ্ন হতো, তবে কোন অসুবিধা ছিল না তার। হাতের খঞ্জরে একটু চাপ দিয়েই এ গাদ্দারের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে সে। কিন্তু মানসুরার ইচ্ছে, তাকে সুলতান

আইয়ুবীর কাছে জীবিত হাজির করা। গোয়েন্দা দলে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, গোয়েন্দাদের কাছে অনেক রকম তথ্য থাকে। ধরতে পারলে তাদের জীবিত রাখতে হয়।

মনে মনে মানসুরা আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। বলতে লাগলো, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মদদ দাও। এ পাদ্দারকে যেন আমি সুলতান আইয়ুবীর হাতে তুলে দিতে পারি, সে তৌফিক দাও আমাকে।'

সহসা তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সে চিন্তা করে দেখলো, সে যদি এখানে বসে চিৎকার করে তবে সে চিৎকার কারো না কারো কানে পৌঁছবেই। রাতে চিৎকারের আওয়াজ নিশ্চয়ই অনেক দূর পৌঁছে যাবে। যদি আশেপাশে কোথাও কোন সৈন্য বা প্রহরী থাকে, তবে তারা অবশ্যই তার সাহায্যে ছুটে আসবে। দুশমন এলাকা এখনো অনেক দূর। তার চিৎকার শুনে কেউ যদি এগিয়ে আসে তবে সে আইয়ুবীর সৈন্য ছাড়া আর কেউ হবে না।

মায়মুনা সহসা সেই দুঃসাহসিক কাজটিই করে বসলো। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, 'আশেপাশে কে কোথায় আছো, জলদি এসো-ও-ও! আমাকে বাঁচাও-ও-ও! জলদি এসো-ও-ও! আমাকে বাঁচাও-ও-ও.....'

আজাদ অসাড় হয়ে পড়েছিল মাটিতে। সমানে চিৎকার করে চলছিল মানসুরা। গর্দান থেকে সরে পড়েছিল খঞ্জর। মানসুরার এ অন্যমনস্কতার সুযোগে হঠাৎ জোরে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠলো আজাদ। পিঠের ওপর থেকে ছিটকে একদিকে পড়ে

গেল মানসুরা। আজাদ উঠে তার তলোয়ারের দিকে ঝুঁকলো, মানসুরা চোখের পলকে উঠে বসে সর্বশক্তি দিয়ে আজাদের পিঠে ধাক্কা দিল। তলোয়ার আর তোলা হলো না তার, হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোন রকমে উঠেই দে ছুট। অসহায়ের মত আজাদের ছুটন্ত অবয়বের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল মানসুরা, তারপরই মনে হলো, 'আরে! একি করছি আমি? ও তো পালিয়ে যাচ্ছে!'

সাথে সাথেই মানসুরাও উঠে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করতে করতে ছুটলো তার পিছনে। সে অনুভব করলো, তার পায়ে আবার ফিরে এসেছে পূর্ণ শক্তি।

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে সে চিৎকারের শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলছিল। আইয়ুবীর নৈশ প্রহরীদের কানে পৌঁছল সে চিৎকারের শব্দ। প্রহরীরা অবাক হলো, এমন গভীর রাতে কোন্ মেয়ে আর্তনাদ করছে এ নির্জন পার্বত্য প্রান্তরে!

তারা যেদিক থেকে মানসুরার আর্তনাদ ভেসে আসছিল সে দিকে ছুটে গেলো। ছুটতে ছুটতে আজাদ এক পার্বত্য নদীর তীরে এসে পৌঁছল। সামনে নদী দেখে বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। মানুসরাও এসে পৌঁছল নদীর তীরে। ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন প্রহরী সেনা সেখানে এসে পৌঁছে গেলো। আজাদ নিরূপায় হয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে। মানুসরা চিৎকার করে বললো, 'ওকে যেতে দিওনা, ও এক গুপ্তচর, জ্যান্ত ধরে আনো ওকে।'

প্রহরীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। একটু পর ওরা আজাদকে ধরে নদীর তীরে তুলে আনলো। আজাদ ধস্তাধস্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখা হলো। এতক্ষণ প্রহরীরা ঘটনা প্রবাহের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন কিছু খতিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি। এবার সুস্থির হয়ে ওরা তাকালো যুবতীর দিকে। মানসুরা ধৃত যুবক আজাদের দিকে তাকিয়েছিল। আজাদ ও মানসুরাকে দেখে প্রহরীদের মনে হলো, হয়তো এটা প্রেমঘটিত কোন ব্যাপার স্যাপার হবে। কিন্তু এ মেয়ে যে বলছিল, 'ও গুপ্তচর!' ঘটনা কি জানার জন্য ওরা মানসুরাকে প্রশ্ন করলো, 'তুমি চিৎকার করছিলে কেন?'

মানসুরা এ প্রশ্নের উত্তরে সব ঘটনা ওদের খুলে বললো। ওরা কেমন করে এ যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছেছে তার উল্লেখ করে বললো, 'এ যুবক দামেশক থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এখানে এসেছিল। গ্রুপ বিভাজনের সময় সে আমাদের গ্রুপে পড়ে। কিন্তু তার চালচলন ও কথাবার্তায় আমার সন্দেহ হয়, সে দুশমনের গোয়েন্দা। কিন্তু এখন আমি সে সন্দেহের উর্ধে উঠে গেছি। সে যে দুশমনের গোয়েন্দা এ ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিত। একে সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে চলো।'

'হ্যাঁ, চলো। সেখানে গেলেই বুঝা যাবে কে গুপ্তচর।' আজাদ বললো, 'বন্ধুরা! তোমার আমার কথা শোন! নারী যে এত ছলনাময়ী আগে জানতাম না। এ মেয়ে আমাকে ফাঁসানোর জন্য এমন জঘন্য পথ ধরবে ভাবিনি। গুপ্তচর আমি নই, এ

মেয়ে। আমাকে নয়, তোমরা আগে ওকে বন্দী করো।'

এক প্রহরী বললো, 'তোমাদের কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক আমরা জানি না। ঠিক আছে, আগে সুলতানের ওখানে চলো, সেখানে গিয়েই দেখবো কে গুপ্তচর, তুমি, নাকি এই মেয়েটা?'

আজাদ টহলদার সেনাদের বললো, 'আসলে আমরা কেউ গুপ্তচর নই। মানসুরা, যথেষ্ট হয়েছে। আমি তো বার বার বলেছি, ওই মেয়েকে আমি ভালবাসি না। আমি তোমাকেই ভালবাসি। ও আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তোমাকে মিথ্যে বলে বিভ্রান্ত করেছে। ঠিক আছে, আমি ওয়াদা করছি, আর কোনদিন তার সাথে আমি কথাও বলবো না। এবার ক্যাম্পে চলো।'

'আজাদ! আর কতো ভণ্ডামী করবে? কবে তোমার কাছে আমি প্রেম নিবেদন করেছি যে, আমাকে তুমি তোমার প্রেমিক সাজিয়ে ওদের হাত থেকে নিস্তার পেতে চাইছো?'

টহল সৈনিক মানসুরার দিকে ফিরে বললো, 'দেখো মেয়ে, আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করো না। সত্যি করে বলো, তোমরা কে? যদি দু'জন এদিকে বদমাইশী করতে এসে থাকো, তাও খুলে বলো। প্রেমিককে রাগের বশে গুপ্তচর হিসাবে ফাঁসিয়ে দিলে পরে কিন্তু এর জন্য পস্তাতে হবে।'

মানসুরা বললো, 'তোমাদের সন্দেহ দূর করার জন্য এটুকু বলাই আশা করি যথেষ্ট হবে, আমি মুশালের খতীব ইবনে মাখদুমের কন্যা। বাবার কাছেই আমি গোয়েন্দাবৃত্তির ট্রেনিং

পেয়েছি। নইলে ও যে গুপ্তচর তা হয়তো আমি টের পেতাম না। তোমরা আমাদের দু'জনকেই ধরে আইয়ুবীর দরবারে পেশ করে দাও, তিনিই আসল সত্য উদঘাটন করবেন।'

মানসুরার কথা শুনে আজাদের সব আশা ভরসা ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। সে এবার লুকোচুরি বাদ দিয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হলো। বললো, 'বন্ধুরা, আমার একটি কথা শোন। তোমরা এখানে কত টাকা বেতন পাও? সামান্য ক'টা টাকা ও দুই বেলার রুটির জন্য তোমরা এখানে মরতে এসেছো। আমার সাথে চলো, আমি তোমাদের শাহজাদা বানিয়ে দেবো। এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ের সাথে বিয়ে দেব তোমাদের। অর্থ-সম্পদে ধনী বানিয়ে দিব।'

প্রহরীরা হেসে বললো, 'ঠিক আছে বন্ধু। তোমার প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। পরে না হয় আমরা তোমার সাথেই যাবো, কিন্তু আগে একটু কষ্ট করো। চলো আমাদের সঙ্গে, আগে সুলতান আইয়ুবীর সাথে একটু দেখা করি।'

৩

সুলতান আইয়ুবীর তাঁবুর পাশেই হাসান বিন আবদুল্লাহর তাঁবু। প্রহরীরা আজাদ ও মানসুরাকে তাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে গেল। ঘুমিয়ে ছিলেন কমাণ্ডার। তিনি তাদেরকে নিয়ে সে রাতেই হাসান বিন আবদুল্লাহর তাঁবুতে হাজির হলেন। হাসান বিন আবদুল্লাহকে জাগিয়ে তাঁর কাছে মানসুরা ও আজাদকে সমর্পণ করলেন।

মানসুরা হাসান বিন আবদুল্লাহকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। যখন মানসুরা তাকে পিছু ধাওয়া করার বর্ণনা শোনাচ্ছিল, হাসান তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন মানসুরাকে। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার চেহারা আমার কাছে খুবই পরিচিত লাগছে। সম্ভবত তুমিই মুশাল থেকে পালিয়ে এসেছিলে. তোমার সাথে মুশালের খতিব ইবনুল মাখদুমও ছিলেন।'

'আমি তারই একমাত্র কন্যা!' মানসুরা বললো।

'তুমি আমাকে বিস্মিত ও হতবাক করে দিয়েছ!' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'আমাদের মেয়েদের সাহস ও বীরত্বে আমরা সকলেই কমবেশী চমৎকৃত, কিন্তু গোয়েন্দাবৃত্তিতে কেউ এমন তীক্ষ্ণ সতর্কতা, বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না।'

'আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।' মানসুরা বললো, 'আমার কানে এমন দু'টি শব্দ এসেছিল, যা থেকে আমি বুঝে নিয়েছিলাম, ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে।'

আজাদের দেহ তল্লাশী চালিয়ে কিছু কাগজ পাওয়া গেলো। কাগজের ওপর হিম্মাত পর্বত শ্রেণীর একটি নিখুঁত নকশা এবং তাতে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনীর পজিশন সুন্দরভাবে চিহ্নিত ছিল। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল, সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধের পূর্ণ প্ল্যান শত্রুদের হাতে চলে যাচ্ছিল।

হাসান বিন আবদুল্লাহ কাগজটি আজাদের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এর পরেও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে, তুমি

দুশমনের গোয়েন্দা নও? যদি তোমার কিছু বলার থাকে, বলে ফেলো। যদি নির্দোষ হও তবে আমার কাছে তার প্রমাণ পেশ করো। তুমি যে খৃস্টান নও, মুসলমান– তাও তোমাকে প্রমাণ করতে হবে।'

'আমি গোয়েন্দা নই, এ ব্যাপারে আমি হাজার বার আল্লাহর কসম খেতে পারি।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ তার মুখের ওপর এমন জোরে ঘুঁষি মারলেন যে, আজাদ চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাসান বিন আবদুল্লাহ ধীর কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কাফেরদের চর সেজে আবার আল্লাহর কসম খাওয়া! আমি এখন আর তোমার কাছে জানতে চাই না, তুমি গুপ্তচর কি না। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, এখানে তোমার কয়জন সঙ্গী সাথী আছে। তুমি যদি বাঁচতে চাও, তবে তাদের প্রত্যেকের নাম ঠিকানা বলে দাও। তারা কে কোথায় কি অবস্থায় আছে কোন রকম চালাকির আশ্রয় না নিয়ে তা পরিষ্কার করে বলে যাও।'

'আমি মুসলমান!' আজাদ অনুনয় করে বললো, 'আমি সব কথাই বলে দেবো, আমাকে ক্ষমা করুন! আমি সুলতানের প্রথম সারিতে যুদ্ধ করবো।'

'আগে আমার কথার জবাব দাও।' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'কোন রকম শর্ত আরোপ না করে আমি যা জিজ্ঞেস করছি শুধু তার জবাব দাও।'

আজাদ ছিল চরম ধড়িবাজ ও পাকা গোয়েন্দা। সে বললো, 'বিশ্বাস করুন, আমি এখানকার আর কাউকে চিনি না।

দামেশক থেকে আমি একাই এসেছি।'

'এই মেয়ে তোমার তাঁবুতে অন্য যে লোকটির কথা শুনেছিল, সে লোকটি কে?'

'আমি তাকে চিনি না!' আজাদ উত্তর দিল, 'সে লোকটি রাতের বেলা এসে সংকেতের মাধ্যমে আমার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং রাতের অন্ধকারেই আমাকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে চলে গিয়েছিল।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ তার দু'জন কর্মীকে ডাকলেন। তাদের বললেন, 'একে টর্চার সেলে নিয়ে যাও। জিজ্ঞেস করে বের করো কারা এর সঙ্গী আর তারা কোথায় আছে?' তিনি মানসুরাকে বললেন, 'তুমি এবার তোমার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ো। ফজরের জামায়াতের পর তোমাকে আবার ডাকা হবে।'

০

সুলতান আইয়ুবী ফজরের নামাজ আদায় করলেন। হাসান বিন আবদুল্লাহও তার সাথে জামাতে শরীক হলেন। নামাজ শেষে তিনি সুলতানকে বললেন, 'খতিব ইবনুল মাখদুমের কন্যা রাতের অন্ধকারে এক গুপ্তচরকে পাকড়াও করেছে।' তিনি সমস্ত ঘটনা সুলতানকে শোনালেন। সুলতান বললেন, 'ইসলামের বীর নারীরা যুগে যুগে এমনি সব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিবি খাওলার উত্তরসুরী এ মেয়েদের ত্যাগ তিতীক্ষা এবং কোরবানীও স্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

জাতি চিরকালই ওদের নিয়ে গর্ব করবে। সে গুপ্তচর কোথায়?'
'ও আমার তত্ত্বাবধানেই আছে।' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'আগে আমি তার কাছ থেকে আমার যা জানা দরকার জেনে নেই, তার পরে আপনার কাছে নিয়ে আসবো। সে এক সুদর্শন যুবক। নিজেকে দামেশকের নাগরিক বলছে। এখানে সে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছিল।'
আজাদকে একটি গাছের ডালের সঙ্গে উল্টো করে লটকানো হলো। তার মাথা মাটি থেকে দেড়গজ উপরে ঝুলছে। নিচে আগুনের জ্বলন্ত কয়লার টুকরা। এক সৈনিক একটু পর পর আগুনে কি যেন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। যার ধোঁয়া ও ঝাঁঝালো গন্ধে আজাদ ছটফট করছিল আর কাশতে কাশতে মরছিল।
হাসান বিন আবদুল্লাহ এসে তাকে নিচে নামালেন। তার চোখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। শরীরের সব রক্ত এসে জমা হয়েছিল মুখের ওপর। তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়ার পরও সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। কিছুক্ষণ বেহুশের মত মাটিতে পড়ে রইলো। তার চোখে মুখে পানির ছিটা দেয়া হলো। একটু পর চোখ খুললো সে। হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে বললেন, 'এ তো কেবল শুরু। যদি সব কথা খুলে না বলো তবে তোমার শরীরের হাঁড় একটা একটা করে আলাদা করে দেয়া হবে।'
সে পানি খেতে চাইলো। হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'তোমাকে দুধ পান করাবো। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'
তিনি এক সিপাইকে বললেন, 'ওর জন্য দুধ নিয়ে এসো। সেই সাথে একটি ঘোড়া এবং রশিও নিয়ে আসবে। রশি ওর পায়ের

সাথে বেঁধে ঘোড়ার পিছনে বাঁধতে হবে।'

এ কথা শুনেই আজাদ তার দুই সহযোগীর নাম বললো। এ দু'জনও স্বেচ্ছাসেবক দলের ছিল। রাতে যে তার সাথে কথা বলেছিল, সে তাদেরই একজন। সে দামেশকে গুপ্তচরদের আড্ডার ঠিকানাও দিল হাসান বিন আবদুল্লাহকে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দুই স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করার আদেশ দিলেন। এরপর আজাদকে দুধ পান করিয়ে নিয়ে গেলেন সুলতান আইয়ুবীর কাছে।

'তুমি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

'দামেশকের!'

'কার সন্তান তুমি?'

আজাদ দামেশকের এক জায়গীরদারের নাম বললো।

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে চিনি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'সে তো এখনো দামেশকেই আছে?'

'না, আল মালেকুস সালেহের সৈন্যরা দামেশক থেকে পালিয়ে গেলে বাবাও পালিয়ে হলবে চলে যান।'

'আর তোমাকে গুপ্তচরগিরী করার জন্য দামেশকে রেখে যান, তাই না?' সুলতান আইয়ুবী তার কথার রেশ ধরে বললেন।

'আমি নিজেই দামেশকে থেকে গিয়েছিলাম।' আজাদ বললো, 'আমার বাবা এক লোকের হাতে চিঠি দিয়ে জানালেন, গোয়েন্দাগিরী করো। বাবার নির্দেশেই আমি এ পথে আসি।' সে জোড় হাত করে সুলতান আইয়ুবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে

বললো, 'আমি সত্যি মুসলমান! আমাকে বাবাই বিপদগামী করেছে। আপনি আমাকে এখানেই রেখে দিন। আমি আমার গোনাহের কাফফারা আদায় করতে চাই।'

'আল্লাহ তোমার গোনাহ ক্ষমা করুন।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি আল্লাহর বিধানে কোন হস্তক্ষেপ করতে চাই না। এখানে তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তও নিতে বসিনি। আমি শুধু আল্লাহর কুদরত ও মহিমা দেখছি, আর যত দেখছি ততই বিস্মিত ও অভিভুত হচ্ছি। বলতে পারো, কোন সাহসে একটি যুবতী মেয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র এক গোয়েন্দাকে পাকড়াও করতে রাতের আঁধারে একাকী পথে বের হয়? আর সেই বা কেমন পুরুষ, যার হাত থেকে একজন নারী তলোয়ার ফেলে দিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়?'

আজাদ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। সুলতান তাকে বললেন, 'কথা বলো যুবক, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলো, তোমার মত সুদর্শন ও বলিষ্ঠ এক যুবককে একটিমাত্র মেয়ে কেমন করে কাবু করল?'

'যদি সে পিছন থেকে আমার পায়ের গোড়ালী অকস্মাৎ সজোরে টেনে না ধরতো, আমি পড়তাম না।'

'তবুও তুমি পড়ে যেতে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যার ঈমান বিক্রি হয়ে গেছে, সে যে কোন আঘাতেই পড়ে যায়। আর সে পড়লে মুখ থুবড়েই পড়ে। যদি তুমি সত্যের পথে থাকতে, ঈমানদারদের সাথে থাকতে, তবে তোমাকে দশ জন কাফেরও ফেলতে পারতো না। তুমি জানো না, আসল শক্তি

বাহু ও তলোয়ারে নয়, ঈমানের বলই আসল বল।'

এরপর সুলতান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে কি কি দেখেছো?'

'আমি এখানে অনেক কিছুই দেখেছি।' আজাদ বললো, 'আমাকে বলা হয়েছিল, মিনজানিক কামান ও তীরন্দাজ বাহিনী কোথায় আছে, সে সন্ধান নিতে। আমি সেগুলো দেখে নিয়েছি। এছাড়া আমার দুই সাথী আমাকে আরও কিছু তথ্য দিয়েছে।'

'তোমার আগে তোমার কোন সাথী কি এমন কোন তথ্য নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পেরেছে?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন।

'না।' আজাদ উত্তরে বললো, 'আমার জানা মতে, আমরা তিনজন ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। বিশ্বাস না হয় আপনি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। আপনার কাছে আমি মোটেও মিথ্যে বলবো না।' সে কাতর কণ্ঠে বললো, 'আপনি আমাকে দয়া করুন, একটু সুযোগ দিন। আমি আর কোনদিন বিপথে যাবো না।'

'সে ফয়সালা মিশরের কাজী করবে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তোমার সাথে এ জন্যই কথা বলছি, তুমি মুসলমানের সন্তান! তোমার তো আমাদের সাথেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি বিপথে চলে গেছ।

যুবক, আমি জানি দামেশকে তোমার ভালবাসার ফাঁদে একাধিক মেয়ে আটকা পড়ে আছে। তোমার চেহারা ও

শরীরের গঠন যে কোন মেয়ের মন কেড়ে নেয়ার মত। কিন্তু এখন সে সব মেয়েরা তোমাকে ধিক্কার দেবে। তোমার মুখে ওরা থু দেবে। আল্লাহও তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি বলতে পারি না, দামেশকের কাজী তোমাকে কি শাস্তি দেবেন। যদি তিনি মৃত্যুদন্ড দান করেন, তবে মরার আগে আল্লাহর কাছে তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিও। অন্তত: মরার আগে মুসলমান হয়ে মরতে পারবে।'

'আমার বাবাকে কি শাস্তি দেবেন?' আজাদ রাগের সঙ্গে বললো, 'এ পাপের পথে তিনিই আমাকে টেনে নামিয়েছেন। তিনিই আমার অন্তরে অর্থের লালসা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমার মন থেকে ঈমানের আলো সরিয়ে দিয়েছেন।'

'আল্লাহর বিধান তাকেও ক্ষমা করবে না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'অর্থের নেশা ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য, ঈমানী শক্তি চিরন্তন জীবনের কল্যাণের উৎস। এ উৎসধারা কোনদিন শেষ হয় না।'

'মাননীয় সুলতান! আমি আপনাকে আরো কিছু কথা বলতে চাই।' আজাদ বললো, 'আমার বাবা কোন ধনী লোক ছিলেন না। তিনি অর্থের কাঙাল ছিলেন। আমার দু'টি বোন ছিল। তারা দু'জনই সুন্দরী ও পরিপূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠলো। বাবা দু'জনকে দুই আমীরের হাতে তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে দরবারে স্থান করে নিলেন। তিনি তার দুই মেয়ের মূল্যে অনেক কিছু লাভ করেছেন। আমীরদের বুদ্ধিতেই তিনি গোয়েন্দাগিরী শুরু করেন। পরে আমাকেও এ কাজে নিযুক্ত

করে দেন। আমার মনে অর্থের লোভ তিনিই ধরিয়েছেন। নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর আমার বাবা আরও উঁচু পদে আসীন হন। তিনি আল মালেকুস সালেহের প্রভাবশালী ওমরায় পরিণত হয়ে যান। ততদিনে তিনি ষড়যন্ত্রে আরো অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। বিশাল জায়গীরের মালিক হয়েছেন। আপনার সেনাবাহিনী এলে তিনি আল মালেকুস সালেহ ও তার সভাষদদের সাথে পালিয়ে যান।'

'কিন্তু তুমি পালাও নি কেন?'

'বিশাল জায়গীরের দেখাশোনার জন্য বাবা আমাকে দামেশকে রেখে যান। কিছুদিন পর হলব থেকে একজন লোক এলো বাবার চিঠি নিয়ে। সে চিঠিতেই বাবা আমাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়তে পরামর্শ দেন। লোকটি আমাকে দামেশকে তাদের এক গোপন আড্ডায় নিয়ে যায়। আড্ডা থেকে যখন আমি ফিরি তখন আমার হাতে অনেক টাকা। দু'তিন দিন পর আমাকে জানানো হলো, আমাকে কি করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে। সেই থেকে আমি তাদের সাথে মিশে গেলাম এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামেই দিন কাটাতে লাগলাম।

একদিন আমাদের দলের সরদার বললো, 'যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক যাচ্ছে। তোমরা কয়েকজন তাদের সাথে মিশে যাও।' তার নির্দেশেই আমরা তিনজন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলাম। এখানে আসার সময় আমাকে বলে দেয়া হলো, এখানে আপনার সৈন্যদের অবস্থান ভালভাবে দেখে নিয়ে যেন

তা ওদের জানাই। আমার সাথী দু'জন আমাকে এখানকার নকশা তৈরি করে দিয়েছে। তারা এ তথ্যও দিয়েছে যে, আপনি আপনার বাহিনীকে এখানকার পর্বতশ্রেণীর আড়ালে রেখে শত্রুদেরকে এই পার্বত্য অঞ্চলে টেনে আনতে চান। এ জন্য আপনি পর্বতমালার যেসব গোপন স্থানে তীরন্দাজ ও মিনজানিক লুকিয়ে রেখেছেন, আমরা সে সব দেখেছি।'

তার দু'চোখ দিয়ে সমানে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। সে বললো. 'আমি ধরা পড়ে গিয়ে এখন বুঝতে পারছি, আমি বিরাট পাপ করেছি। আপনার কথা আমার মনে ঈমানের জোশ এনে দিয়েছে। যদি আমার বাবা আমার মধ্যে অর্থের লোভ সৃষ্টি না করতেন তবে আমার ঈমান নষ্ট হতো না। সুতরাং এ পাপ তো আমার বাবার! মহানুভব সুলতান! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমাকে দয়া করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করার সুযোগ দিন। আমাকে ক্ষমা করুন।'

সুলতান আইয়ুবী হাসান বিন আবদুল্লাহকে ইশারা করলেন। তিনি আজাদকে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন।

০

সে দিনই আজাদকে দামেশকের পথে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তার সাথে দিল দু'জন রক্ষী সেনা। তিনজনই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করলো। আজাদের হাত রশি দিয়ে বাঁধা।

ইফতারীর সময় হয়ে এসেছে প্রায়। সূর্য ডুবতে বেশী বাকী নেই। তারা ততক্ষণে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে। এক

জায়গায় থেমে গেল তারা। ইফতারীর আয়োজন করলো। আজাদের হাতের বাঁধন খুলে দিল ইফতারীর জন্য।

রাতে তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। রক্ষী সৈন্য দু'জন তাবু খাটাল। রাতের খাওয়া ও এশার নামাজের পর সৈন্য দু'জন ঠিক করল, তারা পালা করে রাত জাগবে।

ইফতারী ও রাতের খাবারের সময় দুই রক্ষী তার কাছে শুনলো, তার অপরাধের কাহিনী। আজাদ লোক পটানোয় ছিল ওস্তাদ। এ সুযোগকে সে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগালো। তাদের সাথে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বললো যে, ওরা তার মধুর কথা ও ব্যবহারে একেবারে গলে গেলো। রাতে শোবার আগে ওরা আবার আজাদের হাত বাঁধবে বলে চিন্তা করেছিল, কিন্তু এ কথা বলতেই যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল তাদের। তারা ভাবল, সে নিরস্ত্র, পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? তাছাড়া কেউ একজন তো রাতে পাহারায় থাকছেই, সুতরাং ওরা আর তার হাত বাঁধার প্রসঙ্গ তুলল না।

রাত। তাবুর ভেতর এক প্রহরী ও আজাদ শুয়ে আছে। বিছানার পাশেই রাখা প্রহরীর অস্ত্রপাতি। আজাদ শোয়া থেকে উঠে বসল। পাশের প্রহরী ঘুমিয়ে আছে। প্রহরীর অস্ত্রপাতি পড়ে আছে পাশে। সে প্রহরীর তলোয়ার নিজের কোমরে ঝুলিয়ে নিল। তারপর সন্তর্পনে বাইরে বেরিয়ে এল তাবুর। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ভান করে সরে গেল তাবুর কাছ থেকে। ডিউটিরত প্রহরী দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

এমনি একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিল আজাদ। সে হাঁটতে

হাঁটতে ঘোড়াগুলোর কাছে গেল। তারপর সহসা একটি ঘোড়ায় চড়ে বসে তীর বেগে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। তাবুর পাশে দাঁড়ানো প্রহরী চমকে উঠে তাকালো বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর দিকে। দেখলো একটি ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আজাদ। সে ছুটে তাবুতে প্রবেশ করে সঙ্গীকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'এই, জলদি ওঠো! বন্দী পালাচ্ছে!'

তারা দৌড়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। হাওয়ার গতিতে ছুটলো তার পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু ততক্ষণে আজাদ তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। রক্ষীরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েও আজাদের কোন সন্ধান পেল না। তাদের পিছু ধাওয়া করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে চললো তারা।

গভীর রাত। পথও উঁচু নিচু অসমতল। কোথাও উঁচু টিলা, কোথাও পাথর। তারা ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে অনেক রাতে ফিরে এল তাবুতে।

পর দিন পরাজিত দুই সৈনিক মাথা নত করে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছলো হাসান বিন আবদুল্লাহর কাছে। এক রক্ষী বললো, 'আমাদের গ্রেফতার করুন, কয়েদী পালিয়ে গেছে।' তারা আরও জানালো, 'ইফতারী করার সুবিধার্থে আমরা কয়েদীর হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিলাম।' কর্তব্যে অবহেলার দায়ে হাসান বিন আবদুল্লাহ তাদেরকে বন্দী করলেন।

এদিকে ভয়ে ও আতংকে তার চেহারায় নেমে এলো দুশ্চিন্তার ছায়া। কারণ আজাদ কোন সাধারণ বন্দী ছিল না। তার কাছে আছে সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সৈন্য সমাবেশের

চিত্র, যার ওপর নির্ভরশীল যুদ্ধের জয়-পরাজয়। হাসান বিন আবদুল্লাহ ভাবছিলেন, কি করে তিনি ঘটনাটি সুলতান আইয়ুবীকে বলবেন। কোন মুখে বলবেন, গোয়েন্দা কয়েদী পালিয়ে গেছে! আমাদের সমস্ত প্ল্যান নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে আজাদ।

হাসান বিন আবদুল্লাহ যখন সুলতান আইয়ুবীকে আজাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, সুলতান আইয়ুবীর চেহারার রংও বদলে গেল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে তাঁবুর মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। ঐতিহাসিক আসাদুল্লাহ আল-আসাদী লিখেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী কঠিন বিপদেও হতাশ বা ভীত হতেন না। কিন্তু আজাদের পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তার চেহারা যেন রক্ত শূন্য হয়ে গেল। চোখ দুটো হয়ে উঠেলো নিষ্প্রভ।

তিনি তাঁবুতে পায়চারী করতে করতে থেমে গেলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ জাল্লে জালালুহু! তোমার কি এটাই মঞ্জুর যে, আমি এখান থেকে চলে যাই? তবে কি তোমার করুণা ও ক্ষমা আমার প্রতি নেই? আমি কোনদিন অস্ত্র সমর্পণ করিনি, কখনও পিছু সরে আসিনি। তুমি কি চাও না, চতুর্মুখী শত্রুর মোকাবেলায় আমি তোমার দ্বীনের ঝাণ্ডাকে উর্ধে তুলে রাখি?' ধীরে ধীরে তার স্বর গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠল।

এরপর তিনি হাসান বিন আবদুল্লাহর দিকে ফিরে বললেন, 'ঐ

দুই সিপাইকে বেশী শাস্তি দেয়ার দরকার নেই। তাদের মনে কোন কালিমা নেই। শাস্তির ভয়ে যদি তারা পলাতক থাকতো, তবে তা হতো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তারা তোমার কাছে ফিরে এসেছে। ভুলের শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে। কিন্তু তাদের সততা ও ঈমানদারীর পুরস্কারও তাদের প্রাপ্য। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে পেরেশান হয়ে লাভ নেই। এখন সেনাপতিদেরকে ডাকো, নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে বসতে হবে আমাদের।' সুলতান আইয়ুবীর চেহারায় একটু আগের হতাশা ও নৈরাশ্যের ছায়া মাত্র নেই, সেখানে দৃঢ়তা ও সংকল্প যেন টগবগ করে ফুটছিল।

সেনাপতিগণ উপস্থিত হলেন। সুলতান আইয়ুবী তাদের বললেন, 'সেই গোয়েন্দা পালিয়ে গেছে, যে আমাদের প্রতিরক্ষা প্ল্যান সংগ্রহ করেছিল। সে যে নকশা করেছিল, সে নকশা আমরা উদ্ধার করে রেখে দিয়েছি। কিন্তু সে সচক্ষে দেখে গেছে আমরা কিভাবে শত্রুদের ভেতরে এনে ফাঁদে ফেলতে চাই। পলাতকের দুই সাথী এখনও আমাদের কাছে বন্দী আছে। তারা হাসান বিন আবদুল্লাহর হেফাজতেই রয়েছে এখনো। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। আমরা শত্রুদের জন্য যে ফাঁদ তৈরী করেছিলাম, তা ওরা জেনে যাবে পলাতক আসামীর কাছ থেকে। ফলে শত্রুরা আর পাহাড়ের ঘেরাওয়ের মধ্যে আসবে না। হয়ত তারাই আমাদের অবরোধ করে বসবে এবং আমাদের রসদ আসার পথ বন্ধ করে দেবে। এখন বলো, আমাদের আগের প্ল্যানই ঠিক থাকবে, নাকি আমরা সে প্ল্যান

পরিবর্তন করবো?'

সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ অভিমত পেশ করলেন। কিন্তু অভিমতগুলো ছিল পরস্পর বিরোধী। তবে তারা সবাই আগের প্ল্যান পরিবর্তন করার ব্যাপারে একমত পোষণ করলেন।

সুলতান আইয়ুবী তাঁদের বললেন, 'কিন্তু প্ল্যান পরিবর্তনের জন্য সময়ের প্রয়োজন। ভয় হলো, যদি শত্রু এরই মধ্যে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, তবে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। মুক্ত রণাঙ্গণে যুদ্ধ করার মত সৈন্যও আমাদের নেই, এ দিকটিও তোমাদের বিবেচনা করতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, পরিকল্পনা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কমাণ্ডো বাহিনীকে এখন থেকে তৎপর করে তুলতে হবে। তারা রাতে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে দুশমনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, যাতে তারা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এ আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুদের সম্মিলিত কমান্ডের যে শৃঙ্খলা আছে তা তছনছ করে দিতে হবে। তাদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের তিন বাহিনীর ওপরই চালাতে হবে এ আক্রমণ। আমাদের খাদ্যশস্য আসার পথের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমাণ্ডো বাহিনীর সেনাপতিকে সুলতান বললেন, 'তোমাদের প্রধান টার্গেট থাকবে শত্রুর পেট্রোল ও গোলাবারুদের গুদাম। শত্রু সৈন্য ধ্বংসের চাইতেও এগুলো ধ্বংসের দিকেই তোমাদের অধিক মনযোগী হতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর। বারোজন গোয়েন্দা কমান্ডো তাঁর সামনে হাজির

হলো। তারা জানালো, 'খৃস্টানরা হলবে যে গোলা-বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র পাঠিয়েছিল, সেগুলো যুদ্ধের ময়দানে আনা হয়েছে। এইমাত্র এগুলো এসে পৌঁছেছে যুদ্ধের ময়দানে।' কমান্ডোরা আরো জানালো, 'এসব গোলা-বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় রাখা হয়েছে গোপনে আমরা তাও দেখে এসেছি।'

তিনি বললেন, 'রাতে আক্রমণ চালিয়ে এসব গোলা-বারুদ ধ্বংস করে দিতে হবে।'

গোয়েন্দারা জানাল, 'এ জন্য নতুন কোন দলকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। এ কাজ আমরাই সমাধা করতে পারবো।'

তিনি জেহাদের জন্য পাগলপারা এ জানবাজ কমান্ডোদের দিকে গভীরভাবে তাকালেন। হঠাৎ একজনের ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল এবং তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আনতানুস, তুমিও এ দলে এসে গেছো?'

'আমার তো এ দলেই আসা উচিত।' আনতানুস বললো, 'আমি তো বলেইছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'হে আমার প্রিয় বন্ধুরা!' সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডোদের বললেন, দ্বীন ও জাতির সম্মান রক্ষার্থে এখন তোমাদের বড় ধরনের কোরবানী দেয়ার সময় এসেছে। যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব এখন তোমাদেরই নিতে হবে। তোমাদের আশা সফল হোক, এজন্য আমি অন্য কোন দলকে পাঠাবো না। যদি তোমরা সেগুলো ধ্বংস করতে পারো, তবে আগামী দিনের সন্তানেরা তোমাদেরকে স্মরণ করবে কৃতজ্ঞতার সাথে। তোমরা দেখতে পাচ্ছো, আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম। শত্রুদের

তিনটি প্রবল বাহিনীর মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছে তারা। এ বিশাল বাহিনীর কবল থেকে তোমরাই তোমাদের সৈন্যদের বাঁচাতে পারো।'

'ইনশাআল্লাহ্ এ অভিযানে আমরা অবশ্যই কামিয়াব হবো। আপনার প্রতিটি কথা আমরা অন্তরে গেঁথে নিয়েছি। আমাদের ঈমান আমাদের বিজয়ের জামিন। আমরা আপনাকে আশাহত এবং জাতিকে নিরাশ হতে দেবো না।' বললো দলের কমান্ডার।

সুলতান তাদেরকে আরও কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

০

হিম্মাত পর্বত শৃঙ্গের অনতিদূরে সম্মিলিত বাহিনীর বিশাল ক্যাম্প। সারি সারি তাবুতে সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক পাশে আস্তাবল, অন্য পাশে রান্নার ব্যবস্থা। রান্না ঘরের পাশেই সারি সারি গুদামঘর। সেখানে রয়েছে খাদ্য ভাণ্ডার, সৈন্যদের প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী, অস্ত্র ও গোলা বারুদের ডিপো।

রাতে বারোজন কমাণ্ডো হলব থেকে আসা সেই গোলা-বারুদের ডিপোর কাছে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে গোলা-বারুদ ছাড়াও ছিল পেট্রোল ও তেলের গাদা দেয়া অজস্র ড্রাম। সৈন্যরা ড্রামের মুখগুলো খুলে শেষ বারের মত দেখে নিচ্ছিল, মুখগুলো দ্রুত খোলা যায় কিনা। তারপর সে মুখ এমনভাবে

বন্ধ করছিল, যাতে প্রয়োজনের সময় সহজেই তা খুলে ফেলা যায়। সালার ওদের নির্দেশ দিয়েছে, 'আগামী কালই আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সৈন্যরা মার্চ করবে। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা এগিয়ে গেলে তাদের পেছনে যাবে এসব ড্রাম। আইয়ুবীর ক্যাম্পের কাছে নিয়ে রাখতে হবে এগুলো। যদি দিনের আক্রমণ ব্যর্থ হয় তবে যেন রাতে মিনজানিক থেকে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা যায়।'

কেউ কেউ মুখ খুলতে গিয়ে বাইরে ছিটকে পড়া তেল টুকরো কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছিল। কেউ সলতে বানানোর জন্য কাপড়ের বস্তা খুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছিল কাপড়। এসব কাপড় ও তেলে ভেজা সলতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এখানে ওখানে।

এ কাজের জন্য নিয়োজিত বাহিনী রাতের অন্ধকারেও এক মনে কাজ করে যাচ্ছিল, কারণ, ভোরেই সম্মিলিত বাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়বে। আক্রমণ সফল করার জন্য এ আগুনে বোমা হবে মোক্ষম হাতিয়ার।

সুলতান আইয়ুবীর বারোজন কমাণ্ডো এসে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে লাগল ওদের কাজকর্ম। আনতানুস বললো, 'দেরী করে লাভ কি? এসো শুরু করা যাক।'

ওরা ধনুকে সলতেওয়ালা তীর জুড়ল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে একসাথে ছুঁড়ে মারল সেই তেলের ড্রাম লক্ষ্য করে। মুহূর্তে তেলে ভেজা ন্যাকড়া, স্তুপীকৃত কাপড়, ড্রামের গায়ে

লেগে থাকা তেলে আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো বিস্তৃত এলাকায়। আগুন লাগা কয়েকটি ড্রাম ফেটে গেল উত্তাপে। তেল গড়িয়ে গেল চারদিকে। তেলের সাথে পাল্লা দিয়ে লাফিয়ে ছুটলো আগুনের লকলকে শিখা। হতভম্ব সৈন্যরা কি ঘটেছে বুঝার আগেই সে আগুন স্পর্শ করলো গোলা বারুদের স্তুপ। সেখান থেকে সৈন্যদের পোশাক রাখার ঘর এবং খাদ্য গুদামেও ছড়িয়ে পড়লো দুরন্ত অগ্নিশিখা। আতংকে সেখানে হুলস্থুল কান্ড বেঁধে গেল।

সারি সারি ড্রাম সাজিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে। এক ড্রাম থেকে অন্য ড্রামে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছিল আগুন।

সম্মিলিত বাহিনীর সাধারণ সিপাহিরা তখন নিজ নির্জ তাবুতে। কেউ গল্প-গুজব করছিল, কেউ রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চোখ ধাঁধাঁনো আলো, ড্রাম ফাটার বিকট শব্দ আর ওখানকার কর্মরত আহত সৈনিকদের আর্ত চিৎকার শুনে ছুটে তাবুর বাইরে এলো সৈন্যরা। দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠেছিল পুরো এলাকা। কমাণ্ডোরা তখনও বেপরোয়া তীর নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। তাদের তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে ছুটন্ত সৈন্যরা। পর্যাপ্ত আলো থাকায় তাদের প্রতিটি তীর লক্ষ্যভেদ করছিল।

প্রচণ্ড হট্টগোল ও হৈ-হাঙ্গামার কারণে পুরো সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আতংক ও ত্রাস। সৈন্যরা কি ঘটেছে দেখার জন্য হাতিয়ার ছাড়াই বেরিয়ে এসেছিল তাবুর বাইরে। আগুন দেখে খালি হাতেই ছুটলো আগুন নেভাতে। কিন্তু ততক্ষণে

আগুন সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এ আগুন নেভানো বা আয়ত্বে আনার সাধ্য ছিল না কারো। নিরস্ত্র সৈন্যরা বৃথা চেষ্টা বাদ দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইলো, কিন্তু আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা তাদের সে সুযোগও দিল না। তীরের আঘাতে ঘায়েল করে চললো তাদের।

কমাণ্ডোদের তীরের আঘাতে কেউ কেউ ঘায়েল হলো। কেউ কেউ তীরের আঘাত বাঁচিয়ে ছুটে গেল তাবুতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল শত্রু সেনা সংগঠিত হয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলো। শুরু হয়ে গেল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ক্রমেই দুশমনের দল ভারী হতে লাগলো। বারোজন কমাণ্ডোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল শত শত সৈন্য।

প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে কমাণ্ডো বাহিনী। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অগ্নিশিখা। ক্যাম্প জুড়ে তুমুল তোলপাড়। উট আর ঘোড়াগুলো দড়ি ছিঁড়ে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের পায়ের তলে পিষে যাচ্ছে অনেক সৈন্য। দেখতে দেখতে অন্ধকার রাতের শান্তিময় পরিবেশ নরক গুলজার হয়ে উঠলো।

সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্প। সৈন্যরা রাতের খাওয়া শেষ করে তাবুতে ফিরছিল। যাদের রাতের ডিউটি, তারা পোশাক পাল্টে ডিউটিতে চলে গেল। এতক্ষণ যারা ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছিল তারা ইফতারের পর থেকেই অপেক্ষা করছিল বদলী সৈন্যের আগমনের। তাদের প্রত্যাশা পূরণ হলো। নৈশ প্রহরীরা যে যার ডিউটি বুঝে নিল। সুলতান কেবল ক্যাম্পের আশপাশই নয়,

অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত পাহারাদার নিয়োগ করে রেখেছিলেন। পাহাড়ের বিভিন্ন টিলায়, উপত্যকায়, সংকীর্ণ গলিপথে সুলতানের নিয়োজিত পাহারাদাররা ডিউটি দিচ্ছিল।

অন্ধকারে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল এক সৈন্য। হঠাৎ সে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'আগুন! আগুন! আগুন লেগেছে কোথাও! ওই দেখো আগুনের জিহবা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে!'

সুলতান আইয়ুবী প্রহরীর চিৎকার শুনে দ্রুত ছুটে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। দেখলেন, শত্রু ক্যাম্পের অগ্নিশিখায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। অজ্ঞাতেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'সাবাস! সাবাস মুজাহিদ! সাবাস জিন্দাদিল আল্লাহর সৈনিক! আল্লাহ তোমাদের পুরস্কৃত করবেন।'

০

পরদিন সকাল। এক অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে এলো সুলতান আইয়ুবীর তাবুর দিকে। সুলতান তখন তাঁবুতেই ছিলেন। আরোহী এসে দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে সুলতানের খেদমতে হাজির হয়ে সংবাদ দিল, 'শত্রুরা আসছে। তারা এখন মাইলখানেক দূরে আছে। তাদের গতি পর্বত শৃঙ্গের দিকে।'

এ কাসেদ তখনও বিদায় হয়নি, ছুটে এলো আরও এক আরোহী। সে খবর দিল, 'ডান দিক থেকেও শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসছে।'

এ খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী বুঝলেন, শত্রুরা ডান দিক থেকেও আক্রমণ চালাচ্ছে। এ নিয়েই সুলতান আইয়ুবী বড়

দুশ্চিন্তায় ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। কারণ এ দিকের রণসজ্জা আজাদ দেখে গেছে। তিনি অনুমান করলেন, আজাদ হয়তো গত রাতেই ওদের কাছে পৌঁছে গেছে। তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েই তারা আজ আক্রমণ চালিয়েছে।

সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। কাসেদরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো খবরের সন্ধানে। প্রতি মুহূর্তে ময়দানের পরিস্থিতি সুলতানকে অবহিত করার দায়িত্ব তাদের।

পর্বত শৃঙ্গের ওপর তাঁবু টানানোই রইলো। আইয়ুবীর সৈন্যরা পরিকল্পনা মত কিছু তাঁবুতে আর কিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। শত্রুরা দেখলে মনে করবে, এরা এখনও যুদ্ধের খবর পায়নি। মোকাবেলার কোন প্রস্তুতিই নেই ওদের। উপত্যকার মাঝে শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে তীরন্দাজ বাহিনী ততক্ষণে গোপন স্থানে পজিশন নিয়ে বসে গেছে।

শত্রুদের গতি খুব দ্রুত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আইয়ুবীর বাহিনীর কাছাকাছি চলে এলো। তারা যখন দেখলো, আইয়ুবীর বাহিনী এলোমেলো অবস্থায়, ভাবলো, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদেরকে তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেছে। এতে তাদের আনন্দ ও জোশ আরও বেড়ে গেল। প্রচণ্ড উল্লাসে তারা ছুটলো ওদের পিষে মারতে।

সেনাপতি চিৎকার করে বলছিল, 'দ্রুত অগ্রসর হও বীর বাহিনী! বিজয় তোমাদের পদতলে এসে গেছে!'

সুলতান আইয়ুবী এক উঁচু টিলায় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সমস্ত দৃশ্য। ডাইনের ময়দানও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, গুমাস্তগীনের সৈন্যরা সোজা পর্বত শৃঙ্গের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা তাঁর নির্দেশ মত তখন ঘোড়ার পিঠে জ্বীন আটছিলো। শত্রুরা ততক্ষণে একদম কাছে এসে গেছে। সুলতানের পদাতিক সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে দু'একটা তীর নিক্ষেপ করে তাদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলো। শত্রুদের তরফ থেকে গর্জন শোনা গেল, 'পিষে ফেলো, কাউকে জীবিত রাখবে না। সালাহউদ্দিনকে জ্যান্ত ধরবে। তার কল্লা দিয়ে মুড়িঘন্ট রেঁধে খাওয়াব তোমাদের।'

সুলতান আইয়ুবীর একদল অশ্বারোহী সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু দুশমনের প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে আবার পিছু হটে এলো। তারা পিছু হটে এলে এগিয়ে গেল পদাতিক বাহিনী। তারাও যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটতে বাধ্য হলো। তারা যত পিছু হটে ততই উৎসাহ ও আগ্রহ বেড়ে যায় গুমাস্তগীনের সৈন্যদের। তারা আরও প্রচণ্ড জোরে আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে আইয়ুবীর সৈন্যরা এক সংকীর্ণ পথের মোড়ে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গুমাস্তগীনের সমস্ত সৈন্য দু'দিকে পাহাড় বেষ্টিত সেই ময়দানে ঢুকে পড়লো। এটাই চাচ্ছিলেন সুলতান আইয়ুবী। দীর্ঘদিন ধরে এ ফাঁদেই তিনি তাদের ঢুকাতে চাচ্ছিলেন।

পাহাড় পরিবেষ্টিত এ ময়দান দেড় মাইলের মত বিস্তৃত। যেই শত্রু সৈন্য ভেতরে এলো, উপত্যকার দু'দিক থেকে শুরু হলো তীর বর্ষণ। শত্রুদের ঘোড়াগুলো তীর খেয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ছুটাছুটি করতে লাগলো। তাদের পায়ের তলে পিষে যেতে লাগলো দুশমনেরই পদাতিক বাহিনী। একটু আগে এ মাঠের তাবুগুলোতে আইয়ুবীর যেসব সৈন্যদের আনাগোনা করতে দেখেছিল দুশমন, সেসব তাবুগুলো দেখা গেল ফাঁকা। কোন্ ফাঁকে কোন্ দিক দিয়ে তারা সরে পড়লো, সরে তারা কোথায় গেল, কিছুই বুঝতে পারল না গুমাস্তগীনের সেনা কমান্ডার। তারা জানতো না, তাবুর পেছনে উপত্যকায় প্রবেশের গোপন গলিপথ আছে, আর সে পথে এ মাঠ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল আইয়ুবী।

ওরা মাঠে পৌঁছতেই আইয়ুবীর সৈন্যরা গোপনে বেরিয়ে গিয়েছিল সে পথে। ময়দানে শুধু নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁবুগুলো। বাতাসে দুলছিল তাবুর রশি। আর এ রশিগুলোই পথ আটকে রেখেছিল গুমাস্তগীনের অগ্রগামী সৈন্যদের।

কিছুক্ষণ পর আইয়ুবীর সৈন্যরা শুরু করলো আগুনের সলতে মাখা তীর বর্ষণ। তীরগুলো দুশমন নয়, বর্ষিত হচ্ছিল তাদেরই তাঁবুর ওপর। এর ফলে যেসব সৈন্য তাঁবুগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে চাচ্ছিল, তারা পড়ে গেল আগুনের ঘেরাওয়ের মধ্যে। আগুন থেকে বাঁচার জন্য উল্টো দিকে ছুটলো তারা। সৈন্যদের পোশাক, এমনকি ঘোড়ার পশমেও আগুন ধরে গেল। যুদ্ধের ময়দান জুড়ে ছুটতে লাগলো আগুনের লকলকে

অজস্র শিখা। গুমাস্তগীনের সেনাপতি হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। সেনাপতির সাথে কমান্ডারদের আর কমান্ডারদের সাথে সৈন্যদের যোগাযোগের যে অবকাঠামো ছিল তা ভেঙ্গে গেল। দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে সৈন্যরা ছুটছিলো প্রাণ বাঁচাতে। অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি, আহতদের চিৎকার ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে ময়দান জুড়ে কেয়ামতের প্রলয় বয়ে যাচ্ছিল। এত বেশী শোরগোল হচ্ছিল যে, কারোর আওয়াজই আর স্পষ্ট করে বুঝা যাচ্ছিল না।

কমবেশী প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলল এ কেয়ামতের প্রলয়। গুমাস্তগীনের কমান্ডাররা তাদের সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে নিজেরাও ছুটলো এবার।

অপরদিকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তীরন্দাজরা ছিল পেরেশানী মুক্ত। তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গুমাস্তগীনের বাহিনীর বরবাদী ও বিপর্যয়। যেসব সৈন্য হাতিয়ার ফেলে ময়দান থেকে পালাতে চাইতো, তাদের সরে পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্য একটু পর পর তীর নিক্ষেপে বিরতি দিত আইয়ুবীর সৈন্যরা।

দিকবিদিক ছুটতে গিয়ে কেউ কেউ উপত্যকায় ও পাহাড়ের যেসব জায়গায় আইয়ুবীর সৈন্যরা অবস্থান করছিল, সেসব পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করতো। তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যও বাধ্য হয়ে তীর ছুঁড়তে হতো আইয়ুবীর সৈন্যদের। কখনো বা তীর ছোঁড়া বাদ দিয়ে ওপর থেকে ওদের ওপর গড়িয়ে দিত পাথর।

এভাবে ঘন্টা দুই চলার পর পরাজয় মেনে নিয়ে তারা যখন সবাই পালানোর পথ খুঁজছিল, আইয়ুবী সৈন্যদের তীর বর্ষণ বন্ধ করতে বললেন। তীর বর্ষণ থেমে গেল। ততক্ষণে নিভে এসেছিল আগুন। সৈন্যরা তাদের আগুন লাগা পোশাকগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। খালি গায়ে তখন তারা মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তীর বর্ষণ বন্ধ হতেই ময়দানে নেমে এলো নীরবতা। সৈন্যরা পালাতে গিয়ে বুঝতে পারলো, তারা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের ঘেরাওয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলতানের বাহিনীর দিক থেকে ভেসে এলো ঘোষণা, 'তোমরা অস্ত্রসমর্পণ করো! তোমরা আমাদের ভাই! আমরা তোমাদের ধ্বংস করতে চাই না।'

এ ঘোষণার সাথে সাথে সুলতানের অশ্বারোহী সৈন্যদল সামনে অগ্রসর হয়ে ময়দানে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়লো। গুমাস্তগীনের সৈন্যদের যুদ্ধ করার শক্তি ও মনোবল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের অর্ধেকের মত সৈন্য মারা গেছে অথবা আহত হয়ে ময়দানে পড়ে আছে। যারা জীবিত; তাদের মনে ভয় ও আতংক চেপে বসে আছে। তাদেরকে গুমাস্তগীন বুঝিয়েছিল, তোমরা অতি সহজেই বিজয় লাভ করবে। জয়ের আশা নিয়েই তারা ময়দানে এসেছিল, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান বলছে, গুমাস্তগীন তাদেরকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে এসেছে। ফলে এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে তারা অনুভব করলো, বন্দী অবস্থায় হলেও এ পৃথিবীতে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার

একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কেউ নষ্ট করতে চাইলো না, সবাই দ্রুত নিজ নিজ অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করলো।

০

সুলতান আইয়ুবীর পরিকল্পনা সফল হতে যাচ্ছিল, এ সময় দেখা দিল নতুন বিপর্যয়। ডান দিকের খোলা ময়দানে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে এক নতুন বাহিনী। এ বাহিনী অনেক বড় ও বিশাল।

এ দিকটা নিয়ে প্রথম থেকেই চিন্তায় ছিলেন আইয়ুবী। তিনি সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, মরুভূমির ঝড়ের মত শত্রু সেনাদল ছুটে আসছে সে দিক দিয়ে। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে ধূলির মেঘে। সে তুলনায় সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী নিতান্ত ক্ষুদ্র।

তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পর শত্রু সেনাদের পতাকা দেখতে পেলেন তিনি। এ পতাকা হলবের বাহিনীর। সুলতান আইয়ুবী হলব অবরোধ করে তাদের শক্তি ও মনোবল দেখেছেন। তিনি জানেন, এ সৈন্যদল গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের সৈন্যদের থেকে ভিন্ন ধরনের। তাদের বীরত্ব ও কৌশলও ওদের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত।

সুলতান আইয়ুবী কখনও আপন শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারনায় থাকতেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন, তার সামান্য সৈন্য এদের গতি রোধ করতে পারবে না। তাঁর হাতে যে রিজার্ভ বাহিনী আছে এদের মোকাবেলায় তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু

এখনই তিনি তা ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি শক্তি নয়, বুদ্ধি দিয়ে এর মোকাবেলার সমাধান খুঁজছিলেন। পাশে দাঁড়ানো সেনাপতিদের বললেন, 'তোমরা আগের পরিকল্পনা মতই যুদ্ধ চালিয়ে যাও।'

রিজার্ভ বাহিনী ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত একটি বিশেষ বাহিনী ছিল। বাছাই করা অশ্বারোহীদের তিনি এ বাহিনীতে রেখে দিয়েছিলেন।

তিনি দু'জন অশ্বারোহীকে ডেকে বললেন, 'উপত্যকার ওপর থেকে যে তীরন্দাজরা এতক্ষণ তীর বর্ষণ করছিল, তাদের কমান্ডারকে বলো, স্থান বদল করতে। পর্বত শৃঙ্গের ওদিকের যুদ্ধ এখন শেষ। এখন ওদের বলো, পিছনের দিকে সরে এসে নতুন করে পজিশন নিতে।'

তারপর তিনি তার স্পেশাল বাহিনীর সালারকে আদেশ দিলেন, 'বাহিনী সমরাঙ্গণে নিয়ে এসো। আমি নিজে কমান্ড করবো।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর বিশেষ বাহিনী নিয়ে উপত্যকা থেকে নেমে এলেন। সুলতান আইয়ুবীর সাথে কখনও তার নিজস্ব পতাকা থাকতো না। কারণ শত্রু যাতে জানতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। কিন্তু এবার তিনি বাহিনীকে হুকুম দিলেন, 'আমার নিশান উর্ধে তুলে রাখো। দুশমন যাতে বুঝতে পারে, আমি কোথায় আছি।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার বইতে লিখেছেন, 'এই যুদ্ধে নিজস্ব নিশান উড়িয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর বাহিনীকে জানাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজে ময়দানে নেমে এসেছেন এবং

সেনাবাহিনীর কমাণ্ড এখন তিনি নিজেই করছেন। ওদিকে হলববাসীদেরও বলে দিতে চাচ্ছিলেন, এবার তোমরা সরাসরি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে মোকাবেলায় নেমেছো।'

সুলতান আইয়ুবীর প্রতিটি ইঙ্গিত ও ইশারা মুখস্ত ছিল তার বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের। তিনি তাড়াতাড়ি ধেয়ে আসা বাহিনীর গতি রোধ করার জন্য অশ্বারোহীদের পজিশনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুই অশ্বারোহী সামনে, তারপর চার, তারপর ছয়, তারপর পরের সবগুলো আট আট করে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তারা কোথাও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল না। বরং এই ভঙ্গিমায় নিজস্ব অবস্থান অটুট রেখে ওরা ছুটছিল তীব্র বেগে।

এ অশ্বারোহী বাহিনী ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসা শত্রুদের সামনে ছুটে গেল টর্নেডোর গতিতে। দু'দলে যখন টক্কর লাগলো, যেন ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল ময়দান। সুলতান আইয়ুবীর অশ্বারোহী দলের সামনে এসে হলবের বাহিনী এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ছিল, ঝড়ের সময় প্রচণ্ড ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ে কঠিন শীলা ও পাথরের ওপর।

সুলতান আইয়ুবী বাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন যুদ্ধের তীব্রতা। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন সৈনিকদের। হলবের অশ্বারোহীরা অল্পক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল নিজেদের। তারা ডান ও বাম দিকে ছড়িয়ে পড়ে সুলতানের বাহিনীর পাশ কেটে সামনে চলে গেল। যাবার সময় পথে যাকে পেল তাকে বর্শাবিদ্ধ করলো, তলোয়ার দিয়ে কারো মাথা দেহ থেকে

বিচ্ছিন্ন করে দিলো।

হলবের অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে ছিল তাদের পদাতিক বাহিনী। সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে যেতেই সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে পড়ে গেল সেই পদাতিক বাহিনী। সুলতান কালবিলম্ব না করে সমগ্র শক্তি নিয়ে ওদের পদাতিক বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। এ আক্রমণ ছিল এমন তীব্র ও বেপরোয়া যে, হলবের পদাতিক বাহিনী চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। তারা মোকাবেলা করলো বটে, কিন্তু আইয়ুবীর অশ্বারোহীদের বিদ্যুৎগতি বর্শা ও তলোয়ারের আঘাতে তারা কচুগাছের মত ধরাশায়ী হতে লাগল।

অনেকের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল ঘোড়ার পদতলে পিষে। পঙ্গপালের মত এগিয়ে আসছিল হারানের পদাতিক বাহিনী। সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কচুকাটা করে এগিয়ে যাচ্ছিল সম্মুখপানে। নিজেদের বাহিনীর এ অনভিপ্রেত দুর্গতি দেখে দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনী ঘুরে দাঁড়াল। তারা সুলতান আইয়ুবীর অশ্বারোহী দলের পেছন দিক থেকে প্রবল আক্রমণ চালালো। সুলতান আইয়ুবী এই দ্বিমুখী আক্রমণের মোকাবেলা করতে করতে মাঠের বা'দিকে সরে এলেন। এতক্ষণে দুশমন বাহিনী বা'দিকের পাহাড়ের গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকা আইয়ুবীর তীরন্দাজদের নাগালে এলো। পাহাড়ের সেই গোপন স্থান থেকে শুরু হলো শত্রুদের ওপর তীর বর্ষণ। কিন্তু তাতে হলবের সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গলো না।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর অল্প সংখ্যক অশ্বারোহীদের শৃংখলাবদ্ধ করে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। তীরন্দাজদের তীর ছুটলো বৃষ্টির মত। প্রতি মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ছিল হলবের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক। কিন্তু সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কারণে এতে তেমন বিচলিত হলো না হলবের সেনাবাহিনী।
ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'যদি সুলতান আইয়ুবী এমন বেপরোয়াভাবে সেদিন ময়দানে ঝাপিয়ে না পড়তেন তবে এ যুদ্ধের ফলাফল হতো ভিন্ন রকম।'
এ যুদ্ধে আরো একজন অসম্ভব সাহসিকতা ও রণকুশলতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাঁর নাম মুজাফফর উদ্দিন। মুজাফফর উদ্দিন ছিলেন সুলতান আইয়ুবীর সহ-সেনাপতি। সুলতানের কাছ থেকেই তিনি শিখেছিলেন যুদ্ধের কলাকৌশল। তিনি সুলতান আইয়ুবীর চাল ভাল মত বুঝতেন। ফলে সৈন্য সংখ্যার আধিক্য হলে সে যুদ্ধে কি কৌশল গ্রহণ করতে হয় তা তার ভালই জানা ছিল। মুজাফফর উদ্দিন এ যুদ্ধে সে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন সর্বোচ্চ সতর্কতায়।
সুলতান আইয়ুবীর কাসেদ প্রতি দশ মিনিট পর পর তাঁকে ময়দানের অবস্থা অবহিত করছিল। পুরো বাহিনী কোথায় কি অবস্থায় আছে এটা সুলতান যেমন জানতেন, তেমনি জানতেন মুজাফফর উদ্দিন। ফলে সমগ্র বাহিনীকে তিনি এমনভাবে পরিচালনা করলেন, অচিরেই দুশমনকে তিনি নিয়ে গেলেন সেই মৃত্যু ফাঁদে, যে ফাঁদে ফেলে একটু আগে তারা কাবু করেছিলেন গুমাস্তগীনের বাহিনী।

সেখানে তীরন্দাজ বাহিনী পজিশন নিয়ে বসেছিল শত্রুর অপেক্ষায়। তারা তীর বর্ষণ করে বেধড়ক শত্রুদের কাবু করে চললো।

সুলতান আইয়ুবী সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা লক্ষ্য করে তাঁর পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনার চিন্তা করলেন। রিজার্ভ বাহিনীকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ঠিক তখনই এক কাসেদ এসে সংবাদ দিল, 'সুলতান, দামেশক থেকে আগত পাঁচশ' অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবী ময়দানে ছুটে আসছে।'

সুলতান আইয়ুবী ক্ষেপে গেলেন। বললেন, 'কে তাদের আসতে বলেছে? তাদের তো আহতদের সেবা করার ডিউটি দেয়া হয়েছিল!'

তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ময়দানের দিকে তাকালেন। যুদ্ধের সামগ্রিক অবস্থা বেশ জটিল। কৌশলগত দিক থেকে আইয়ুবীর বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও সৈন্য সংখ্যা এতই কম যে, শেষ পর্যন্ত ফলাফল কি দাঁড়ায় বলা মুশকিল। যুদ্ধের ময়দান এখন দাবী করছে আরো সৈন্য। তিনি তাকালেন এগিয়ে আসা বাহিনীর দিকে। ইচ্ছে করলে তিনি এদের ফিরিয়ে দিতে পারেন। তিনি ডাকার আগেই তাদের ময়দানে চলে আসার প্রেক্ষিতে এটাই তার করা উচিত। কিন্তু তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তিনি জানেন, আরোহীদের মধ্যে চারশ মেয়ে ও একশ পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক। তাদের নেতৃত্বে আছে হাজ্জাজ আবু

ওয়াক্কাস। নিশ্চয়ই তারা সেনাপতি শামসুদ্দিনের অনুমতি নিয়েই এসেছে।

পাঁচশ অশ্বারোহী যেভাবে আসছে, তাতে সুলতান বুঝতে পারলেন, এরা কেবল সেনাপতি শামসুদ্দিনের অনুমতি নিয়েই আসছে এমন নয় বরং তারা তারই কমান্ডে এগিয়ে আসছে। তিনি কাসেদকে বললেন, 'যাও, ওদের বলবে, আমি তাদের এ সিদ্ধান্তকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।'

কাসেদ বিদায় নিল। সুলতান আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'আল্লাহ, এদেরকে আমি ময়দানে ডেকে আনিনি। তুমি নিজে থেকে ওদেরকে এ কঠিন ময়দানে পাঠিয়ে দিয়েছো। তুমি ওদের মুহাফিজ হয়ে যাও, ওদের কাজকে তুমি সহজ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের এই মা ও বোনদের অন্তরের দিকে তাকিয়ে তুমি এদের বিজয় দান করো।'

মোনাজাত শেষ করে সুলতান আবার ময়দানের দিকে মনযোগী হলেন। দেখলেন, নবাগত এই অশ্বারোহী দল শত্রু সেনাদের ক্রমশ পাহাড়ী উপত্যকার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দুশমনের পদাতিক বাহিনী দলিত মথিত হচ্ছে তাদের অশ্ব পদতলে।

এ বাহিনীর আগমনে শত্রু সেনাদের অগ্রাভিযান থেমে গেলো। এতক্ষণে টনক নড়লো হলবের যোদ্ধাদের। বুঝতে পারলো, যতটা সহজ মনে করেছিল, বিজয় ততটা সহজ নয়।

সুলতান আইয়ুবী এবার তাঁর সংরক্ষিত বাহিনীকে ময়দানে নিয়ে এলেন। তারা ময়দানে আসতেই দুশমন পুরোপুরি কোনঠাসা হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে লড়ছিল তারা।

মুসলমানের হাতে হতাহত হচ্ছিল মুসলমান। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কাঁপছিল মাটি! দু'পক্ষ থেকেই উচ্চকিত হচ্ছিল এ গগনবিদারী শ্লোগান।

আকাশ নীরব হয়ে দেখছিল এ ভ্রাতিঘাতি যুদ্ধ। খৃস্টানরা খেলা দেখছিল, মুসলিম নিধনের খেলা। ইতিহাসের গতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েরা মোকাবেলা করছিল স্বজাতিরই ভাই ও গুরুজনদের। পিতার বিরুদ্ধে লড়ছিল পুত্র। যুদ্ধের ময়দান রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। জাতির গর্ব ও অহংকার পিষে যাচ্ছিল ঘোড়ার পদতলে।

দিনভর চললো এ রক্তাক্ত লড়াই। সারা দিনের যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, হলববাসীদের মনোবল শেষ হয়ে গেছে। তাদের সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ শুরু করেছে।

আইয়ুবীর রিজার্ভ বাহিনী ততক্ষণে তাদের অবরোধ করে ফেলেছিল। সেনাপতিরা অধিকাংশই পালিয়ে গিয়েছিল ময়দান ছেড়ে। আহতদের আর্তচিৎকারে কাঁপছিল রাতের বাতাস। সারাদিনের যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত মেয়েরা ক্লান্তির কথা ভুলে আহতদের খুঁজে খুঁজে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল। এভাবেই কেটে গেল সারাটা রাত।

সকাল হলো। রাতের অন্ধকার যে দৃশ্য ঢেকে রেখেছিল, প্রভাতের আলোকরশ্মি সে দৃশ্য উন্মুক্ত করে দিল সবার সামনে। এ দৃশ্য ছিল আরো করুণ, আরো বেদনাদায়ক। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শুধু লাশ আর লাশ! কোথাও মানুষের লাশ, কোথাও পশুর। শত শত মৃত ঘোড়া ও মানুষের লাশের বিভৎস

দৃশ্য। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, এমনি করুণ!

যুদ্ধবন্দীদের সরিয়ে নেয়া হয়েছিল ময়দান থেকে। তাদের রাখা হয়েছিল অনেক দূরে। জখমীদের রাখা হয়েছিল ময়দানের কাছেই। সকাল বেলা নতুন করে তাদের ঔষধ ও পট্টি বাঁধার কাজে লেগে গেল গতকালের যুদ্ধ ক্লান্ত এবং রাতভর নির্ঘুম সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবকরা।

একদল স্বেচ্ছাসেবককে দায়িত্ব দেয়া হলো লাশের সৎকারের। তারা প্রথমেই লাশের স্তুপ থেকে খুঁজে বের করলো মেয়েদের লাশ। সেগুলো কবর দিয়ে নজর দিল ময়দানে পড়ে থাকা অন্যান্য লাশের দিকে।

একজন খুনী মানুষের দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারে কিন্তু মানবতা ও সভ্যতাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ক্ষমতার নেশায় পাগল জাতীয় নেতৃবৃন্দ। ক্ষমতার মোহ তাদেরকে এমন অন্ধ ও বধির করে ফেলে যে, তারা মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখতে পায় না, শুনতে পায় না বিবেকের হাহাকার। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তখন তারা অগণিত মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিতে ইতস্তত করে না। আপোষে ও ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে হত্যা করে আপন সম্প্রদায়, এমনকি আত্মীয় পরিজন। এই ভয়াবহ বিবেকহীন আচরণের মারাত্মক পরিণাম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন সুলতান আইয়ুবী। রণাঙ্গণের দৃশ্যে অন্তর তার হাহাকার করে উঠল। তিনি সেনাপতিদের বলছিলেন, 'মানুষের অন্তর থেকে এই মোহ দূর করতে হবে। ইসলাম

কোন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে জেহাদের নাম। যদি পৃথিবীতে এ জেহাদ জারী না থাকে তবে ভাই বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করবে। পুত্র হত্যা করবে পিতাকে। আর এই বিবাদের ঘনঘটায় শয়তান এসে বাসা বাঁধবে মানুষের মগজে। যদি এ বাদশাহীর নেশা আমরা নির্মূল করতে না পারি, তবে আল্লাহর এ দুনিয়ায় আধিপত্য কায়েম হবে শয়তানের। কাফেররা এ জাতির আমীর ও বাদশাহদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ধ্বংস করে দেবে সেই জাতিকে, যাদেরকে আল্লাহ মানবতা ও সভ্যতার রক্ষক নিযুক্ত করেছেন।

হলব, হারান ও মুসালের পরাজিত সৈন্যদের অবস্থা এমন ছিল না যে, তারা পুনরায় আইয়ুবীকে আক্রমণ করবে। দৃশ্যতঃ যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী জানতেন, কখন যুদ্ধ শুরু করতে হয় এবং কোথায় গিয়ে শেষ করতে হয়। তিনি কোন রকম বিরতি না দিয়েই কমাণ্ডো বাহিনীকে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। বাহিনী প্রস্তুত হলে তিনি কেবলমাত্র অশ্বারোহী কমাণ্ডোদের সঙ্গে নিলেন। অবশিষ্ট বাহিনীকে ক্যাম্পে রেখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ক্যাম্প ছেড়ে। সে রাতে প্রথমে তিনি গিয়ে চড়াও হলেন গুমাস্তগীনের ক্যাম্পে। গুমাস্তগীনের ক্যাম্প তছনছ করে ক্যাম্পের সৈন্যদের বন্দী করার পর গিয়ে উপস্থিত হলেন সাইফুদ্দিনের ক্যাম্পে। ক্যাম্পের অবশিষ্ট সৈন্যদের পরাজিত ও বন্দী করে হাজির হলেন হারান থেকে আগত আল মালেকুস সালেহের ক্যাম্পে।

রাতের অন্ধকারে এমন আকস্মিক ও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালালেন যে, কেন্দ্রের মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো তাতে। ভোর হওয়ার আগেই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে দিলেন তিনি। এ আক্রমণে সুলতান আইয়ুবী আরো আগেই সফলতা ছিনিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিপক্ষকে না মেরে বন্দী করা। এ পলিসির কারণেই সম্মিলিত বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য ধরা পড়েছিল আইয়ুবীর সেনাদের হাতে।

৫৭০ হিজরীর ১৯ রমজান! মোতাবেক ১১৭৫ খৃস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল। ভোর রাতে সেহরী খাওয়ার পর সুলতান আইয়ুবী তাঁর প্ল্যানের শেষটুকও কাজে লাগালেন। সম্মিলিত বাহিনীর আলাদা ক্যাম্পগুলো দখল করার পর তিনি সরাসরি আঘাত হানলেন সম্মিলিত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার বলে পরিচিত অফিসিয়াল ক্যাম্পে। এ আক্রমণে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বাঁধা দিল না কেউ।
গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিন তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ হতেই অন্ধকারের সুযোগে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের জমকালো ক্যাম্প দুটোতে পড়েছিল তাদের নিজস্ব মূল্যবান তৈজসপত্র, হেরেমের বেগম ও নাচ-গানের মেয়েরা। আরো ছিল বাজনাদার ও চাকর-বাকররা। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের তাবুতে হানা দিয়ে দেখলো তারা সেখানে নেই।

মেয়েরা সৈন্যদের দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সৈন্যরা তাদের ধরে সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করলো। সুলতান তাদের সবাইকে মুক্ত করে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। সাইফুদ্দিনের ক্যাম্পে সুন্দরী মেয়ে ছাড়াও পাওয়া গেল সুন্দর সুন্দর অসংখ্য পাখী। পাখীগুলো খাঁচায় বন্দী ছিল, সুলতান ওদের মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

সে রাতেই সুলতান আইয়ুবীর সামনে একটি মেয়েকে হাজির করা হলো। সে শত্রুদের ক্যাম্পে লাশের স্তুপের মধ্যে কারো মুখ খুঁজে ফিরছিল। সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা গত রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ ধ্বংস করার জন্য এখানেই আক্রমণ চালিয়েছিল।

মেয়েটিকে দেখেই সুলতান আইয়ুবী চিনতে পারলেন। বললেন, 'তুমি তো গোয়েন্দা আনতানুসের সঙ্গে হারান থেকে এসেছিলে। এখানে কি খুঁজছো?'

'জ্বী!' বললো মেয়েটি, 'আমার নাম ফাতেমা, আমি নারী বাহিনীর সাথে দামেশক থেকে এসেছি। আনতানুস আহত ছিল। আমার বিশ্বাস, গত রাতে সে এখানেই আক্রমণ করতে এসেছিল। আমি আনতানুসের লাশই খুঁজছি।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'না ফাতেমা, তাকে আর খুঁজো না তুমি। এখানে যত লাশ দেখছো, ভেবে নাও সবই তার লাশ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এর কোন লাশে এখন আর আনতানুস নেই। সে চলে গেছে তার মালিকের কাছে। নিশ্চয়ই তার কাজে তার মালিক খুশী হয়েছেন, তাঁকে উত্তম

পুরস্কারই দেবেন তিনি।'

ফাতেমার চোখে অতলান্ত কষ্ট ও বেদনা টলমল করছিলো। উদগত কান্না রোধ করে সে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান। আনতানুস নিজেও বলতো, কমাণ্ডোদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু আমার হৃদয় মানেনি।' ফাতেমার চোখ থেকে বেরিয়ে এলো অবাধ্য অশ্রু। অশ্রুঝরা কণ্ঠেই সে সুলতানকে বললো. 'আনতানুস আমাকে বলেছিল, এসো ফাতেমা, আগে দ্বীনের জন্য আমরা নিজেদের কোরবানী করি। জাতির প্রতিটি যুবক-যুবতীর সামনে যে ফরজ অপেক্ষা করছে আগে তা পালন করি। তারপর যখন বুঝবো আল্লাহ আমাদের গোনাহ মাফ করেছেন, তখন নিজেদের জীবন ও হাসি আনন্দ নিয়ে ভাববো। আর যদি সে ফরজ আদায় করতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দিতে হয়, তাহলে আমাদের সাক্ষাৎ হবে আল্লাহর দরবারে।' ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'সে তো তার ফরজ পালন করে চলে গেল, কিন্তু আমার ফরজ যে এখনো আদায় হয়নি! হায়! যদি গুমাস্তগীনকে হত্যা করে আমিও আমার ফরজ আদায় করতে পারতাম!'

ফাতেমার বিষাদময় চেহারা ও কান্না দেখে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। সুলতান নিজেও মাথা নত করে ঠোঁট কামড়ে তাঁর আবেগ দমন করছিলেন।

পরদিন ভোর। আইয়ুবী তার সালারদের বললেন, 'দামেশক থেকে যে মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল তাদের সবাইকে

ফেরত পাঠিয়ে দাও। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শত্রুদের পরাজিত করার ক্ষেত্রে ওরা যে সাহায্য করেছে, সে কথা আমি কোনদিন ভুলব না। সে সময় সাহায্যের কি প্রয়োজন ছিল তা আমি আর আমার নিয়ন্তা আলেমুল গায়েবই জানি! এ জন্যই মেয়েরা আমাকে না জানিয়ে ময়দানে চলে এলেও তাদের আমি ফেরত পাঠাতে পারিনি। কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ। ওরা যে জন্য এসেছিল সে কাজ সমাধা হয়ে গেছে। তাই এখন আর ওদের এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।'

০

মেয়েদের অসন্তোষ ও কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুলতান আইয়ুবী তাদের দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। তার সামনে এখন অনেক কাজ। তিনি এখন কোথাও থামতে চাচ্ছিলেন না। শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর এ পরাজয় থেকে তিনি আরও ফায়দা নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, 'সেনাবাহিনী, প্রস্তুত হও। তোমাদের এখন হলবের অভিযানে যেতে হবে।'

তিনি সেনাপতিদের সামনে তাঁর পরবর্তী প্ল্যান ব্যাখ্যা করছিলেন। এ সময় দেখতে পেলেন এক অশ্বারোহী তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর তাবুর দিকেই এগিয়ে আসছে। অশ্বারোহীর হাতে বর্শা। বর্শার মাথায় কোন কিছু বিদ্ধ করে নিয়ে আসছে। সে আরো কাছে এগিয়ে এলো, সুলতান আইয়ুবীর বডিগার্ডরা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। সুলতান আইয়ুবী দেখলেন, অশ্বারোহীর বর্শার মাথায় মানুষের ছিন্ন

মস্তক। সুলতান আইয়ুবী তাকে সামনে আসার অনুমতি দিলেন।

সুলতানের সামনে এসে দাঁড়াল অশ্বারোহী। তাকে দেখেই চিনতে পারলেন সুলতান। এ সেই আজাদ বিন আব্বাস। দামেশকে যাওয়ার পথে এ গোয়েন্দাই রক্ষীদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

সে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল। বর্শাবিদ্ধ মাথা সুলতান আইয়ুবীর পায়ের কাছে রেখে বললো, 'আমি আপনার ফেরারী আসামী। আমি বলেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি আমার পাপের কাফফারা আদায় করবো। কিন্তু আপনি আমার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাস্তায় আমি চিন্তা করে দেখলাম, আমার মধ্যে অর্থের লোভ ও আমাকে গাদ্দার বানিয়েছে আমার বাবা।

তাই বাবাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া এ কাজ সমাধা করার কোন উপায় ছিল না। আমি শুধু এ জন্যই সেদিন পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমি সোজা হলবে গিয়ে দেখামাত্র বাবাকে হত্যা করলাম। তারপর তার মাথা কেটে নিয়ে ছুটে এলাম আপনার দরবারে। এতেও যদি আমার গোনাহের কাফফারা আদায় না হয়ে থাকে, তবে আমাকে আবার বন্দী করুন। তারপর আমাকে যা খুশী শাস্তি দিন। দরকার মনে করলে এমনি করে আমার মাথা কেটে ফেলে দিন।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে হাসান বিন আবদুল্লাহর অধীনে দিয়ে

দিলেন। বললেন, 'একে যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে করো তবে তাকে তোমার বাহিনীতে ভর্তি করে নিতে পারো। সে আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। আমি চিন্তা করছিলাম, শত্রুদের গোয়েন্দা এখানকার পুরো তথ্য নিয়ে পালিয়ে গেল, তারপরও শত্রু কিভাবে আমার ফাঁদে এসে পড়লো। এখন বুঝতে পারছি, সে তথ্য জানাতে নয়, বাবাকে হত্যা করতে গিয়েছিল।'

পরের দিন। সুলতান আইয়ুবী তাঁবুতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাননি। হঠাৎ বাইরের শোরগোলে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো, বাইরে কিছু লোক কথা কাটাকাটি করছে।

সুলতান আইয়ুবী দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কি হচ্ছে?'

দারোয়ান বললো, 'নয়জন লোক আপনার রক্ষী দলের পোশাক পরে, আপনার পতাকা বহন করে এখানে এসে হাজির হয়েছে। বলছে, তারা দামেশক থেকে এসেছে। তারা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আপনার দেহরক্ষী হতে চায়। তাদেরকে বাঁধা দেয়া হলে তারা বললো, 'এত দূর থেকে বহু আশা ভরসা নিয়ে আমরা এসেছি। আমাদেরকে তার দেহরক্ষী দলে নিয়োগ না করলে অন্তত তার সাথে আমাদের একবার দেখা করার সুযোগ দিন। তিনি আমাদের কবুল না করলে, তিনি যা বলবেন আমরা তাই করবো।'

এ নয়জন ছিল শেখ মান্নান ও গুমাস্তগীনের পাঠানো ফেদাইন

খুনী। তাদের কৌশল সফল হলো। সুলতান আইয়ুবী দারোয়ানকে বললেন, 'তাদের পাঠিয়ে দাও।'
ওরা তাবুর দরজায় এলে তাদের হাত থেকে বর্শা রেখে দিয়ে ওদের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো। তাঁবুতে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে ওরা খঞ্জর ও তলোয়ার বের করলো। সুলতান আইয়ুবীর দুই রক্ষী তাদের সাথে ভেতরে এসেছিল। মুহূর্তের জন্য তারা হতভম্ব হয়ে গেল।
এক ফেদাইন তলোয়ার বের করে সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করে বসলো। সুলতান আইয়ুবী পলকে এক পাশে সরে দ্রুত তলোয়ার তুলে নিলেন হাতে। আক্রমণকারী দ্বিতীয়বার তলোয়ার তোলার আগেই সুলতানের তলোয়ার তার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। তাবুর স্বল্পপরিসর জায়গায় ঢুকে পড়েছিল বারো জন লোক। জায়গার অভাবে এর মধ্যে স্বাধীনভাবে তলোয়ার চালানো সম্ভব ছিল না কারো পক্ষেই।
সামনের জন লুটিয়ে পড়তেই অন্য ফেদাইনরা সুলতানকে একযোগে আক্রমণ করলো। সুলতানের দুই রক্ষী সুলতানের পাশেই দাঁড়ানো ছিল, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবেলা করতে লাগলো। ভেতরে তলোয়ারের ঝনঝনানি শুনে ছুটে এলো বাইরের রক্ষীরা।
তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই তারা হামলাকারীদের পেছন থেকে আক্রমণ করলো। এবার দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলো আট ফেদাইন খুনী। কিছুক্ষণ তলোয়ার ও খঞ্জরে ঠোকাঠুকি হলো। বডিগার্ডদের প্রতিআক্রমণে ফেদাইনরা বেকায়দায় পড়ে গেল

এবং আইয়ুবীকে খুন করার পরিবর্তে নিজেকে কি করে খুনের হাত থেকে বাঁচানো যায় সে চেষ্টা করতে লাগলো।

দু'তিন জন ফেদাইন খুনী একসাথে রক্ষীদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে কোন রকমে তাবুর বাইরে চলে এলো। রক্ষীরাও সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার চালাতে চালাতে বাইরে বেরিয়ে এলো ওদের সাথে।

সুলতান আইয়ুবীর তলোয়ারের সামনে কেউ টিকতে পারলো না। পাঁচ খুনী মারা গেল সুলতান ও সঙ্গী গার্ডদের হাতে। অবশিষ্টদের তিন জন পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের হত্যা না করে জীবিত গ্রেফতার করা হলো।

এক ফেদাইন খুনী আহত হয়ে পড়েছিল তাঁবুর মধ্যে। রক্তে লাল হয়ে গেছে তার কাপড়। তখনো ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল, লোকটি চুপিসারে উঠে বসলো এবং সুলতান আইয়ুবীর পিছন থেকে আক্রমণ করে বসলো। এক বডিগার্ড দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সুলতান বসুন!' সাথে সাথে সুলতান আইয়ুবী বসে পড়লেন। খুনীর তলোয়ারের আঘাত শূন্যে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বডিগার্ড আততায়ীর বুকে আমূল ঢুকিয়ে দিল বর্শার ফলা। সেও মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। সব মিলে ছয় জন মারা গেল, ধরা পড়লো তিন জন।

সুলতান আইয়ুবীর ওপর আল্লাহর অসীম করুণা, তিনি এবারেও অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন।

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, 'শেখ মান্নানের প্রেরিত এ

ফেদাইন খুনীরা শপথ করে এসেছিল, সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা না করে কেউ জীবিত ফিরে যাবে না। তারা সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারেনি, তবে তাদের কেউ জীবিতও ফিরে যেতে পারেনি। যারা জীবিত ধরা পড়েছিল মৃত্যুদন্ড দিয়ে তাদের সে শপথকে পূর্ণ করা হয়।

o

হলব, হারান ও মুশালের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের পর নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জোর প্রস্তুতি চলছে। সেই প্রস্তুতির ফাঁকে আইয়ুবী ও তাঁর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন অফিসার এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করছিলেন। সৈনিকদের সাহসিকতা ও বীরত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বিগত দিনের যুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতি। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক সিপাহীর অপূর্ব বীরত্বের কথা আলোচনা করলেন এক অফিসার। সুলতান আইয়ুবী তার বর্ণনা শুনে বললেন, 'কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এসব আত্মত্যাগী সৈনিকদের কোন নাম লেখা থাকে না। সেখানে শুধু লেখা হয় সেনাপতির নাম। ঐতিহাসিকদের এটা বড় বে-ইনসাফী। তারা বাদশাহ, সুলতান ও সেনাপতিদের নিচে আর কাউকে দেখতে পান না। যদিও জয়-পরাজয় নির্ধারনের মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু সে বিজয় আসে সৈনিকদের হাত দিয়ে। তাই তো বিজয়ের মাল্য সবসময় সৈনিকদের গলায়ই পরানো হয়।

আমাদের কমাণ্ডো সৈন্যরা শত্রুদের কাছে গিয়ে যদি তাদের বন্ধু

হয়ে যেতো, তবে আমরা কি করতে পারতাম! যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যরা যুদ্ধ করার পরিবর্তে যদি বাঁচার চিন্তাই বেশী করে করতো, তবে কিভাবে বিজয় আসতো? গৌরব তো তাদেরই পাওনা, যাদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বিজয় অর্জিত হয়। ইতিহাসে আমাদের সে বীর সৈন্যদের নাম অবশ্যই আশা উচিত, যারা অসংখ্য শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে বা শাহাদাত বরণ করে। যারা কখনো দ্বীনের পতাকা মাটিতে পড়তে দেয় না। সেনাপতি বা কমান্ডারের ভুলে যদি কখনো যুদ্ধের ময়দানে পরাজয় দেখা দেয়, সে পরাজয় মেনে নেয় না ওইসব মুজাহিদ, যারা তাদের ঈমানের দাবী পূরণ করতে গিয়ে হাসতে হাসতে জীবন বিলিয়ে দেয়। ঈমানই তাদের গলায় পরিয়ে দেয় বিজয়ের মালা। শাহাদাতের গৌরব নিয়ে তারা হাজির হয়ে যায় আল্লাহর দরবারে।'

'কিন্তু সুলতান, আমাদের ব্যর্থতা ও জিল্লতির বড় কারণ নেতাদের ভুল সিদ্ধান্ত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যর্থতা নেমে আসে গাদ্দারদের কারণে। আমাদের কোন ভাই যখন তার ঈমান বিক্রি করে মোনাফেকী করে, তখনই আমরা সবচে বেশী বেকায়দায় পড়ে যাই। সুলতান, আপনি কি বলতে পারেন, গাদ্দারদের সৃষ্টি করে আল্লাহ আমাদের কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন?'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আল্লাহর মহিমা আমরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি! হয়তো এ গাদ্দার সৃষ্টি করে তিনি সব সময় আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। হয়তো

একের পর এক বিজয় লাভ করে যেন আমাদের হৃদয় স্ফীত না হয়ে উঠে তার জন্য সতর্ক করছেন। আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এটা ঠিক, দুশমন নয়, ইসলামের যদি কোন দিন পতন ঘটে তবে তা ঘটবে এ গাদ্দারদের জন্যই। এ গাদ্দাররাই জাতির হৃদয় থেকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও শক্তি শুষে নেয়, মুসলমানদের ঈমান ক্রয় করে জাতিকে ডুবিয়ে দেয় পাপের অতল গহীন অন্ধকারে।

আপনাদের অজানা নেই, খৃস্টানদের সাধ্য সাধনা ও যুদ্ধ আপনাদের সাথে নয়, তাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে। ইসলাম পরিত্যাগ করলেই তারা আপনাদের শত্রু থেকে বন্ধু হয়ে যাবে। তারা বলে, যতদিন ক্রুশের পূজারী দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। তারা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এ শিক্ষা ও সংকল্পই রেখে যায়।

আমি চাচ্ছি, আমরাও আমাদের সৈন্যদের কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করে যাবো। যেমন উত্তর মিশরের মরু এলাকায় এবং হিম্মাতের বরফ ঢাকা এলাকায় করা হয়েছে। বিশেষ করে জানবাজ কমাণ্ডোদের ইতিহাস ও ত্যাগের কাহিনী এমনভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, যা আগামী প্রজন্মের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এসব কমাণ্ডোরা যখন জীবন বাজী রেখে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে যায়, পৃথিবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। গুটিকয় কমাণ্ডো বিশাল শত্রু বহরে শংকা ও ত্রাসের এমন কাঁপন সৃষ্টি করে, যা অনেক সময় একটা সৈন্যবাহিনীও

করতে পারে না। তাদের ত্যাগের কথা স্মরণ করুন, অভিযানে যায় দশজন, ফিরে আসে একজন, দু'জন, কখনো আবার একজনও ফেরে না।'

'জ্বি, আপনি ঠিকই বলেছেন সুলতান. তারা জেনেশুনেই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।'

'না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'বরং বলো তারা জেনেশুনে নিজের জীবন দিয়ে ক্রয় করতে ছুটে যায় শাহাদাতের নিশ্চিত সাফল্য ও গৌরব।'

'হ্যাঁ, সুলতানে মুয়াজ্জাম!' সেনাপতি বললো, 'এটা এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা আমরা ভবিষ্যত সন্তানদের জন্য রেখে যেতে পারি। এ সম্পদ যতদিন এ জাতির হাতে থাকবে, ততদিন বিশ্বে তারাই থাকবে অমর, অজেয়। কে না জানে, প্রতিটি জাতিই বেঁচে থাকে তার বীরদের গৌরবগাথা নিয়ে।'

'কিন্তু বন্ধু, এ ইতিহাস তোমরা কোনদিনই পূর্ণাঙ্গ করতে পারবে না।' বললেন অন্য এক সেনাপতি, 'এ দুনিয়ায় কেবল আমরাই ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছি, এমন নয়। দুনিয়ার প্রত্যন্ত প্রান্তরে এমন অনেক মুজাহিদ আছেন, যাদের খবরও আমরা জানি না। এমন অনেক মুজাহিদ আছেন, যারা ইসলামের জন্য নিজের দেশ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন অন্য দেশে। যেখানে এখনো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, ছুটে গিয়েছেন সেখানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। দেশের বাইরে, জাতির দৃষ্টির আড়ালে তারা এমন যুদ্ধে লিপ্ত, যার সংবাদ হয়তো আমরা কোনদিনই পাবো না।'

'তাতে হতাশা ও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তাদের সামনে যে ধর্মীয় অনুভূতি ও জযবা কাজ করছে, সে জযবা নিয়ে সেখানেও আল্লাহর বান্দারা শামিল হবে সত্যের কাফেলায়। তাদের মধ্য থেকেই জন্ম নেবে নতুন শেরে খোদা, নতুন খালিদ বিন ওয়ালিদ। সেখানে ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরবে যে বীর মুজাহিদরা তাদের মধ্যে আমাদের মত আল্লাহর সৈনিকরাও থাকবে। তারাই একদিন সৃষ্টি করবে নতুন ইতিহাস।'

'কিন্তু সুলতান, আমাদের সে সব ভাইদের ত্যাগ-তিতীক্ষার অনেক খবরই আমরা কোনদিন পাবো না, যারা শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে অসহনীয় কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে। শত অত্যাচার আর নির্যাতনেও তারা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সইতে সইতে জীবন বিলিয়ে দেয়। জাতি যখন বিজয়ের গৌরব লাভ করে, তখনও জাতি তাদের কথা জানতে পারে না। তারা দৃষ্টির আড়ালে থেকেই জাতির সম্মান ও গৌরবকে আরও গৌরবময় করে তোলে। তাদের অপরিসীম সাহস ও ত্যাগের কাহিনী আমরা কখনোই জানতে পারি না।'

'হ্যাঁ, এমন সব মুজাহিদের কিছু কিছু কাহিনী কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে।' বললেন সুলতান আইয়ুবী, 'যেমন উমরু দরবেশ। সে ছিল এক সুদানী মুসলমান। আমার ভাই তকিউদ্দিন সুদান আক্রমণ করে এবং শত্রুদের ধোঁকায় পড়ে সুদানের মরুভূমির গভীরে ঢুকে পড়লে যখন তাদের জন্য খাদ্য

ও রসদ পাঠানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তখনকার ঘটনা। শত্রুরা রসদ পাঠানোর রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তকিউদ্দিনের সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। তকিউদ্দিনের বিভিন্ন গ্রুপ ও দলের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেখানে মুসলিম বাহিনী অনেক ক্ষতি ও বিপর্যয়ের শিকার হয়। তাদের এগিয়ে যাওয়া বা বেরিয়ে আসার আর কোন সুযোগ ছিল না।

সুদানীরা সে সময় অনেককে যুদ্ধবন্দী করে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এদের মধ্যে তকিউদ্দিনের দু'তিন জন সেনা কমান্ডারও ছিলো। এ কয়েদীদের মধ্যে মিশরী ও বাগদাদীদের সংখ্যা ছিল বেশী, কিছু ছিল সুদানী মুসলমানও।

আমি যখন তকিউদ্দিনের বিচ্ছিন্ন সৈন্যবাহিনীকে সুদান থেকে বের করে আনি, তার আগেই ওরা ধরা পড়ে গিয়েছিল। আমি সুদানীদের কাছে চিঠি ও দূত পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ বন্দীদের মুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে। সুদানীরা সে প্রস্তাব অস্বীকার করে বললো, যেহেতু আমাদের কাছে তাদের কোন সৈন্য কয়েদী হিসাবে নেই, সেহেতু এ প্রস্তাব বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই তাদের। তবে তারা মিশরের কিছু এলাকার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করতে পারে। তখন আমি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেই, ইসলামী রাজ্যের এক ইঞ্চি জায়গাও আমি তোমাদের দিতে পারবো না। কিন্তু আমাদের সৈন্যদের ফেরত না দিলে সে জন্য তোমাদের কঠিন মূল্য দিতে হবে। আমাদের সৈন্যরা কোরবানী দিতে জানে, এ কথাটা তোমরা ভুলে যেও না।

তারপরের ইতিহাস তোমাদের জানা। সুদানীরা যে হাবশীদের দিয়ে মিশর আক্রমণ করিয়েছিল, তাদের একজনও দেশে ফিরে যেতে পারেনি। যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে বন্দী করা হলো। আশা করলাম, সুদানীরা এবার বন্দী বিনিময় করবে। কিন্তু তারা কোন দূত পাঠাল না। তারা হাবশীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতারণা করে মিশরে ঢুকিয়েছিল। এরা কেউ সুদানের নিয়মিত সৈন্য ছিল না। এ হাবশীদের আমরা মজদুর বানিয়েছিলাম। তাদের দিয়ে পাহাড় কাটিয়েছি, গর্ত খুঁড়িয়েছি, ক্ষেত-খামারের কাজেও লাগিয়েছি, কিন্তু তাদের দিয়ে কোন বন্দী বিনিময় সম্ভব হয়নি। কিন্তু কেন তারা বন্দী বিনিময় করেনি, এ খবর পেয়েছি পরে।

সুদানীরা চাচ্ছিল, মিশরীয় বাহিনীর বন্দী সৈন্যদেরকে তাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিতে। তোমরা জানো, খৃস্টানরা সুদানীদের সামরিক উপদেষ্টা ছিল। তারাই সুদানীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। তারা সুদানীদের পরামর্শ দিল, যে কোন প্রকারেই হোক, মিশরী সৈন্যদেরকে সুদানী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। তারা সে চেষ্টাই করেছে। কিন্তু তারা কতজন মুসলমান সৈন্যকে তাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিতে সমর্থ হয়েছিল সে খবর আমরা পাইনি। পরে জেনেছি, ভালবাসা দিয়ে, আদর দিয়ে, সৌজন্য ও ভদ্রতা দিয়েও যখন তারা ব্যর্থ হয়, তখন তারা নির্দয়ভাবে তাদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই কয়েদীদের মধ্যে ইসহাক নামে আমাদের একজন

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছিল। সে আমাদের সেনাদলের গ্রুপ কমান্ডার থেকে ক্রমান্বয়ে অফিসার পদে উন্নীত হয়। সে ছিল সুদানের বাসিন্দা। যৌবনে মিশরের সেনাবাহিনীতে এসে যোগদান করে।

সুদানের এক পাহাড়ী এলাকায় চার-পাঁচ হাজার মুসলমানের বাস ছিল। বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল তারা। ইসলাম তাদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন তৈরী করে। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একটি ঐক্যবদ্ধ কমিটি দ্বারা পরিচালিত হতো। সব কবিলার লোকই এ কমিটির আদেশ ও মীমাংসা মেনে চলতো। তাদের মধ্যে একটি প্রথা গড়ে উঠল, তাদের সন্তানরা যৌবনে পা দিলেই অভিভাবকরা তাকে মিশরের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু তারা কখনো সুদানী ফৌজে ভর্তি হতে চাইতো না। সুদানীরা তাদেরকে তাদের বাহিনীতে নিতে চাইলেও তারা আপত্তি করতো। পাহাড়ী সন্তান হিসাবে তারা ছিল অসম্ভব কর্মঠ, সাহসী ও বীর। যোদ্ধা হিসাবে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তীরন্দাজীতে সিদ্ধহস্ত।

সুদানী সরকার তাদেরকে সৈন্যবাহিনীতে নেয়ার জন্য অনেক লোভ দেখাল। কিন্তু লাভ হলো না। তারপর তাদের ভয় দেখাল, তাতেও কাজ হলো না। অবশেষে সুদানী সরকার তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের ওপর চাপিয়ে দিল যুদ্ধ। কিন্তু পাহাড়ী সে মুসলমানদের ওপর পর পর দু'বার আক্রমণ করেও ব্যর্থ হলো তারা। মুসলমান তীরন্দাজরা পার্বত্য উপত্যকা থেকে এমন তীর বর্ষণ করে যে, সুদানী

অশ্বারোহীরা তীর খেয়ে নিজেদের পদাতিক বাহিনীকেই ঘোড়ার পদতলে পিষে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

যা বলছিলাম, তকিউদ্দিনের সামান্য ভুলের জন্য সুদানীদের হাতে মিশরের বহু সৈন্য বন্দী হয়ে যায়। সেই বন্দীদের মধ্যে ওই পাহাড়ী কবিলার কমান্ডার ইসহাকও ছিল। নিজের কবিলার ওপর তার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। যুদ্ধ বন্দী হয়ে সুদানীদের হাতে পড়ার পর তাকে বলা হলো, যদি তুমি সুদানী বাহিনীতে যোগ দাও এবং তোমার সম্প্রদায়কে সুদানী সেনাবাহিনীতে ভর্তি করাও, তবে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেবো না, বরং যে পাহাড়ী এলাকায় তোমরা বসবাস করো, সে অঞ্চলকে আলাদা প্রদেশ করে তার শাসনভার তোমার হাতে তুলে দেবো। তুমি হবে সেখানকার সুলতান।'

'আমি সেখানকার সুলতান আগে থেকেই আছি।' ইসহাক উত্তর দিল, 'ওটা তো আগাগোড়াই আমাদের স্বাধীন রাজ্য।'

'সেটা তো সুদানেরই এলাকা।' সুদানীরা বললো, 'আমরা যে কোন দিন সে এলাকা থেকে তোমাদের উচ্ছেদ এবং বন্দী করতে পারি।'

'হ্যাঁ, তোমরা সে অঞ্চল আগে দখল করো।' ইসহাক বললো, 'সেখানকার মুসলমানদের ধ্বংস করা বা তাদেরকে তোমাদের সৈন্য দলে ভর্তি করার খায়েশ তোমাদের কোন দিনই পূরণ হবে না। তোমরা সে এলাকায় তোমাদের পতাকা নিয়ে গিয়ে দেখো, যদি তাদের পদানত করতে পারো, তার পরে আমাকে তোমাদের বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য দাওয়াত দিও।'

এতসব কথার পরও ইসহাককে ওরা কারাগারে না রেখে একটি সুন্দর সাজানো বাড়ীতে রাখলো। এতই সুন্দর, যেন কোন শাহজাদার মহল। তারপর একদিন সুদানী সেনাপতি সেখানে এসে হাজির। তিনি তার কামরায় প্রবেশ করে দু' হাতে তলোয়ার নিয়ে নতজানু হয়ে তার সামনে রাখলো এবং বললো, 'আপনার মত রণবীরকে আমরা মন থেকেই সম্মান করি! আপনি আমাদের কয়েদী নন, সম্মানিত মেহমান!'
'আমি আপনার তলোয়ার গ্রহণ করতে পারি না।' ইসহাক বললো, 'আমি মেহমান নই, কয়েদী। আমি পরাজিত এক বন্দী। আমি আপনার কাছ থেকে তলোয়ার সেভাবেই নেবো, যেভাবে আপনি আমার হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছেন। তলোয়ার তলোয়ারের শক্তি দ্বারাই নিতে হয়।'
'কিন্তু আমরা আপনার শত্রু নই।' সুদানী সেনাপতি বললো।
'কিন্তু আমি তো আপনার শত্রু!' ইসহাক হেসে বললো, 'তলোয়ারের বদল এমন সুন্দর কামরাতে হয় না, তলোয়ারের বদলা যুদ্ধের ময়দানে হয়। আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি, কারণ আপনি আমাকে সম্মান দেখিয়েছেন।'
'আমরা এর চেয়ে বেশী সম্মান দেব আপনাকে।' সুদানী সেনাপতি বললো, 'আপনার সিংহাসন খার্তুমের মসনদের সাথেই রাখা হবে।'
'কিন্তু কিয়ামতের পরে সে সিংহাসন জাহান্নামের অতল তলে থাকবে।' ইসহাক বললো, 'কারণ দুনিয়াতে খার্তুমের মসনদ ইসলামের দুশমনের করতলগত ছিল।'

'আমি দুনিয়ার কথা বলছি।'

'কিন্তু মুসলমান আখেরাতের চিন্তাই বেশী করে। যে সময় মানুষের আমলনামা আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।'

ইসহাক বললো, 'আমাকে বলুন, আপনার পরে কে আসবে, আর সে আমার জন্য কি উপহার নিয়ে আসবে?'

সুদানী সেনাপতি হেসে বললো, 'তাতে কিছু যায় আসে কি? আমি সৈনিক, আপনিও সৈনিক। আমি আপনার সৈনিকত্বের মূল্য দিচ্ছিলাম। কিন্তু আপনি আমার মনটা ভেঙ্গে দিলেন।'

'আপনি আমার সৈনিক জীবনের গৌরব কি দেখেছেন?' ইসহাক বললো, 'আমাদের তো যুদ্ধ করার সুযোগই হয়নি। আমাদের সৈন্যরা মরুভূমির এমন প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে ছিল, যেখানে পানির একটা ফোটাও নেই। চারটি দিন ভয়াল মরুভূমিতে আমাদের কেটেছে পানি বিহীন। আমাদের পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী দল পানির অভাবে কি যে কষ্ট করেছে তা বর্ণনা করার মত নয়। আমাদের ঘোড়াগুলো পানির অভাবে মরে গেলো। সৈন্যরা যখন উষ্ঠাগত প্রাণে জিহ্বা বের করে পানির অভাবে কাৎরাচ্ছিল, তখন আপনারা সেখানে হাজির হলেন। বাধ্য হয়ে যুদ্ধ না করেই আমরা সবাই আপনাদের হাতে ধরা দিলাম। আপনি আমাদের তলোয়ারের তেজ কোথায় দেখলেন? আমাদেরকে তো পরাজিত করেছিল সেই মরুভূমি। আপনি আমার বীরত্বের উপহার দিতে এসেছেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে, আপনি একজন বীর যোদ্ধা, কুশলী সালার।' সেনাপতি বললো।

'শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই! ইসহাক বললো, 'আগামী কাল একটি তলোয়ার নিয়ে আমার কাছে আসবেন। একটি আপনি নিবেন, একটি আমি। সেই মোকাবেলার পর আশা করি আপনার কোন কথাতেই আমি অরাজী হবো না। কারণ, তখন তো আর আপনি জীবিত থাকবেন না!'

সেনাপতি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইসহাক তাকে বললো, 'ভাল করে শুনে নিন সম্মানিত সেনাপতি। আপনারা আগামী কাল আমাকে যে কারাগারে পাঠাবেন, এক্ষুণি সেখানে পাঠিয়ে দিন। কারণ আপনাদের কোন আশাই সফল হবে না। আমি এ সুন্দর কামরা কেন, কোন কিছুর বিনিময়েই আমার ঈমান বিক্রি করবো না।'

'কারাগারের জঘন্য পরিবেশে না থেকে আপনি এ মনোরম পরিবেশেই সুন্দরভাবে চিন্তা করতে পারবেন।' সেনাপতি বললো, 'আমি আশা করবো, আপনার সামনে যে শর্ত রাখা হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আরো গভীরভাবে চিন্তা করবেন। আপনার এক সৈনিক ভাই হিসেবে আমার পরামর্শ হচ্ছে, এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, যাতে আপনার ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকারে ডুবে যায়। আল্লাহ আপনার ভাগ্যে বাদশাহী লিখে রেখেছেন, কেন আপনি ভাগ্যের সে লেখা নষ্ট করবেন?'

'আমার আল্লাহ আমার ভাগ্যে কি লিখে রেখেছেন সেটা তিনিই ভাল জানেন।' ইসহাক বললো, 'আর আপনার ভাগ্যে কি লিখে রেখেছেন তাও জানেন। ভাগ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, এখন আপনি যেতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন আমার

আরো চিন্তা করা দরকার, তবে আমার বলার কিছু নেই।'

সেনাপতি চলে গেলেন। একটু পর খাবার নিয়ে কামরায় ঢুকল তিনটি মেয়ে। রূপসী, সুন্দরী, যুবতী। নামে মাত্র পোশাক পরণে। হরেক রকম উপাদেয় খাবার ওরা টেবিলে সাজিয়ে রাখল। এতসব খাবার সে জীবনেও দেখেনি। সুন্দরীদের হাতে শরাবের পাত্র। ওরা তাকে খাবার গ্রহণের জন্য আহবান করলো।

ইসহাক প্রয়োজন মত খাবার গ্রহণ করলো। খাওয়া শেষে পানি পান করে উঠে এলো টেবিল থেকে। একটি মেয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। ইসহাক তার দিকে তাকালো, ঠোঁটে তার ব্যঙ্গের হাসি।

'আমাকে কি আপনার পছন্দ নয়?' মেয়েটি বললো।

'আমি তোমার মত বিশ্রী মেয়ে জীবনেও দেখিনি।' ইসহাক বললো।

মেয়েটার মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে কেবল সুন্দরীই ছিল না, পরিপূর্ণ যৌবনবতীও ছিল। ইসহাক তার মনের ভাব বুঝে বললো, 'নারীর সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার লজ্জাবোধের মধ্যে। মেয়েরা উলঙ্গ হলে তার আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। তোমার এ অর্ধ উলঙ্গ দেহে আকর্ষণের কি আছে? তোমার সৌন্দর্যের যাদু তো তুমিই শেষ করে দিয়েছো! তোমাকে দেখে আমার লজ্জা আর ঘৃণাই বাড়ছে শুধু।'

'আপনি কি আমাকে দেখেও আমার প্রয়োজনবোধ করছেন না?' মেয়েটি বললো।

'না, নির্লজ্জ ও বেহায়া মেয়ের কোন প্রয়োজন নেই আমার।' ইসহাক বললো, 'আমার প্রয়োজন একটি পবিত্র আত্মার , যা তুমি কোনদিনও আমাকে দিতে পারবে না। অতএব এবার তুমি যেতে পারো।'

'কিন্তু আমাকে তো আপনার পাশে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।' মেয়েটি বললো, 'যদি আমি সে আদেশ অমান্য করি তবে শাস্তি স্বরূপ আমাকে হাবশী পশুদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'দেখো মেয়ে, আমি একজন মুসলমান!' ইসহাক বললো, 'আমাদের ধর্মীয় বিধান অমান্য করে আমি তোমাকে এ কামরায় রাখতে পারবো না। যদি তুমি এ কামরাতেই থাকতে চাও, তবে থাকো, আমি বাইরে চললাম।'

'এতেও আমার অপরাধ হবে।' মেয়েটি বললো, 'আপনি আমার উপর একটু দয়া করুন, আমাকে এ কামরাতেই থাকতে দিন। আপনিও থাকুন।'

'তা হয় না। এমন দয়া আমি করতে পারবো না।'

মেয়েটি দেখলো, এ লোক বড়ই পাষাণ! সে ইসহাকের কাছে অনুনয় বিনয় শুরু করলো।

'তোমার কাজটা কি?' ইসহাক তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি উদ্দেশ্যে তোমাকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে? তুমি তোমার উদ্দেশ্য বলে দাও, দেখি আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি কি না!'

'আমার দায়িত্ব? আমার দায়িত্ব পুরুষ মানুষকে মোমের মত

নরম করা, তাদের চাহিদা মেটানো।' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'আপনিই প্রথম পুরুষ, যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি কত ধার্মিক পুরুষকে এ রূপের জালে জড়িয়েছি, সুদানীদের গোলাম বানিয়ে তবে ছেড়েছি তাদের। আপনি কি সত্যিই আমাকে বিশ্রী মনে করেন, না ঠাট্টা করছেন?'

'তুমি যাকে সুন্দর মনে করো, আমার চোখে তা অসুন্দর। যাকে তুমি সুগন্ধ বলো, আমি তাকে বলি দুর্গন্ধ।' ইসহাক বললো, 'আমার দৃষ্টিতে তুমি সত্যি কুৎসিত। ঠিক আছে, তুমি এ কামরায়ই থাকবে। তুমি যেখানে শুতে চাও শুয়ে পড়ো। তুমি পালঙ্কে শয়ন করলে, আমি নিচে বিছানা করবো।'

মেয়েটি বললো, 'না, আপনিই পালঙ্কে শয়ন করুন, আমি নিচে বিছানা করছি।'

'তোমার নাম কি?' ইসহাক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার নাম আশী!'

'তুমি কি খৃস্টান, না মুসলমান?' 'আমার কোন ধর্ম নেই।'

'তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন?'

'জানি না!' মেয়েটি বললো।

ইসহাকের চোখে ঘুম এসে গেলো, কিছুক্ষণ পরেই তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলো মেয়েটি।

০

'আপনি অযথা এ লোকটির পিছনে সময় নষ্ট করছেন।' আশী বললো। তার সামনে সুদানী সামরিক বাহিনীর উর্ধতন অফিসার

বসেছিল। আশী তাকে বললো, 'এ লোকটির মধ্যে কামনা বাসনা বলে কিছু নেই। আপনি তো জানেন, কঠিন পাথরকে গলিয়ে মোম বানাতে আমার জুড়ি নেই। কিন্তু এমন লোক আমি জীবনেও কোথাও দেখিনি।'

'আমার মনে হয়, তুমি কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছো।' অফিসার বললো।

মেয়েটি ইসহাককে আকৃষ্ট করতে যে সব কথা বলেছিল সবই অফিসারের সামনে খুলে বললো। বললো, 'আমার কথা শুনে লোকটি শুধু ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে। শুয়ে কথা বলা শুরু করার কিছুক্ষণ পরই সে ঘুমিয়ে গেছে।'

চার পাঁচ দিন পর সুদানী সেনাপতি আবার ইসহাকের সাথে দেখা করে। সে ইসহাককে তার কথার মধ্যে আনার জন্য হেন চেষ্টা নেই, যা করেনি। রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত কথার জাদু প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয় সে। ইসহাক তার কথার জবাবে বার বার শুধু বলছিল, 'আমি মিশরের সেনাবাহিনীর একজন অফিসার! এখন আমি তোমাদের কয়েদী। আমাকে যত খুশী শাস্তি দাও, কিন্তু আমি আমার ঈমান বিক্রি করতে পারবো না।'

অবশেষে তাকে সে মহল থেকে বের করে কয়েদখানায় নিয়ে বন্দী করে রাখা হলো। লোহার শিকওয়ালা দরোজার সাথে তালা লাগিয়ে চলে গেল প্রহরী। কয়েদখানার কামরা দুর্গন্ধে ভরা। সে দুর্গন্ধে ইসহাকের দম বন্ধ হয়ে এলো।

তখনো রাত শেষ হয়নি। এক সিপাহী বাতি নিয়ে এলো। সে

শিকের ফাঁক দিয়ে ইসহাকের হাতে বাতি দিল। ইসহাক বাতি নিয়ে বিছানার ওপর যখন বসলো, দেখলো কামরার মধ্যে একটি লাশ পড়ে আছে। সে পঁচা লাশের দুর্গন্ধই এতক্ষণ তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। লাশের মুখ খোলা, চোখও খোলা। লাশটা ফুলে উঠেছে। ইসহাক কারাগারের সিপাইকে ডাকলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো, এ লাশটা কার?'

'তোমাদেরই কোন সাথীর লাশ হবে।' সিপাহী উত্তর দিলো, 'কোন মিশরী সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়ে ধরা পড়েছিল। কঠিন শাস্তি দেয়ার পর সইতে না পেরে পাঁচ-ছয় দিন হয় কুঠরীতে মরে পড়ে আছে।'

'লাশ এখানে ফেলে রেখেছো কেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার জন্য!' সিপাহী ব্যঙ্গ করে বললো, 'একে উঠিয়ে নিলে তুমি একা হয়ে যাবে।' সিপাহী হাসতে হাসতে চলে গেল।

ইসহাক বাতি নিয়ে লাশের কাছে এগিয়ে গেলো। বাতি উপরে তুলে লাশের মুখে আলো ফেললো। পোশাক দেখেই চিনতে পারলো, ঠিকই, এ এক মিশরী সৈন্যের লাশ। ইসহাক এতক্ষণ যে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, সে দুর্গন্ধের অনুভূতি তার দূর হয়ে গেল। লাশের পচনে পোকা কিলবিল করছিল। ইসহাক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বন্ধু, তোমার দেহ হয়তো পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার আত্মা বেহেশতের পুষ্পিত বাগানে বেঁচে থাকবে চিরদিন। আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি জীবন দেয়, মৃত্যু তাকে কখনো স্পর্শ করতে

পারে না। তুমি সৌভাগ্যবান! তুমি মহীয়ান, গরীয়ান! আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান তুমি! তুমি জীবিত এবং চিরকাল তুমি বেঁচেই থাকবে। সিপাহী ঠিকই বলে গেছে, তুমি না থাকলে আমি একা হয়ে যেতাম। এখন আমি আর একা নই। চিরঞ্জীব এক বন্ধু এখন শুয়ে আছে আমার পাশে।'

সে অনেকক্ষণ লাশের পাশে বসে বসে কথা বললো। যেন দুই বন্ধু গল্প করছে। গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পায়নি। সকালে এক প্রহরী এসে তাকে জাগালো।

ঘুম থেকে জেগেই সে দেখলো, সেই সুদানী সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তাকে জেগে উঠতে দেখে সেনাপতি বললো, 'কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বলবেন। আমার প্রহরীরা আপনার দিকে বিশেষ নজর রাখবে।'

'আমি পরাজিত ও বন্দী বলে তুমি ইচ্ছে মত আমাকে গাল দিতে পারো। যত খুশী ব্যঙ্গ ও উপহাস করতে পারো।' ইসহাক বললো, 'আর যদি আমার কোন প্রয়োজন পূরণ করতে চাও, তবে যুদ্ধের ময়দান থেকে মিশরের একটি পতাকা এনে দাও। আমি এ লাশটিকে সে পতাকা দিয়ে ঢেকে দিতে চাই।'

সেনাপতি হো হো করে হেসে বললো, 'তোমাদের পতাকা কি আমরা বুকে নিয়ে বসে আছি? আমরা মিশরের পতাকা স্পর্শ করতেও দ্বিধাবোধ করি।' তারপর প্রহরীর দিকে ফিরে বললো, 'একে এখান থেকে বের করে নিচে নিয়ে যাও। লাশ এখানেই পড়ে থাক।'

ইসহাককে কারাগারের অন্ধকার পাতাল কুঠরীতে নিয়ে গেল।

সেখানেও পড়ে ছিল অসংখ্য লাশ। বিশ্রী দুর্গন্ধে বাতাস গুমোট। সুদানী সেনাপতি নাকে রুমাল চেপে আগে আগে যাচ্ছিল। এক জায়গায় ছয় সাতজন মিশরী কয়েদীকে উল্টো করে বেঁধে লটকে রাখা হয়েছিল। তাদের বাহুর সাথে বাঁধা ছিল ভারী পাথর। আরেকটু এগুতেই দেখতে পেল, একজন মিশরীকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। তার হাতের পাঞ্জা পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে দেয়ালের সাথে। তখনো রক্ত ঝরছে সে হাত থেকে!

আর এক জায়গায় টেবিলের ওপর এক কয়েদীকে দেখতে পেলো। কয়েদীকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছে টেবিলের সাথে। পাঁয়ের সাথে শিকল বাঁধা। টেবিলের সাথে লাগানো বিশাল চাকা। চাকা যখন ঘুরাতো তখন সে লোকের হাত ও পায়ে এমন টান পড়তো যে, তা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতো কয়েদী।

ইসহাককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হলো জেলখানা। কোথায় কেমন শাস্তি দেয়া হচ্ছে সব দেখলো ইসহাক। স্থানে স্থানে রক্ত জমা হয়ে আছে। কোথাও কয়েদীরা বমি করছে। কোথাও বেহুশ হয়ে পড়ে আছে কেউ। শাস্তির বিচিত্র রূপ দেখিয়ে সুদানী সেনাপতি বললো, 'আপনার কোন্ শাস্তি প্রয়োজন তা বলে দেবেন, আমি সেখানেই নিয়ে যাব আপনাকে। আর যদি আপনি এ শাস্তি ছাড়াই আমার কথা মেনে নেন, তবে তাতে আপনারই মঙ্গল হবে।'

'যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যাও, জাতির সাথে বেঈমানী ও

গাদ্দারী করতে পারবো না আমি।' ইসহাক দৃঢ়তার সাথে বললো।

'আমি তোমাকে আবারও বলছি, আমরা তোমাকে দিয়ে যা করাতে চাই, তার বিনিময়ে তোমাকে আমরা মুক্তই করবো না. পাহাড়ী এলাকার সুলতানও বানিয়ে দেবো। কিন্তু তুমি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছো। এখন শুধু এই শর্ত দিতে পারি, যদি মেনে নাও তবে তোমাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। তোমাকে সুদানী বাহিনীর কোন ভাল পদে নিয়ে নেয়া হবে।'

'আমি তোমাদের কোন পদ চাই না, আমাকে যা খুশী শাস্তি দাও।' ইসহাক বললো।

তার পায়ে শিকল বেঁধে ছাদের সাথে সে শিকল আটকে দেয়া হলো। উল্টো হয়ে শূন্যে ঝুলে রইল ইসহাক। সেনাপতি প্রহরীকে বললো, 'সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রাখবে। সন্ধ্যার পর উপরের ওই লাশের কামরায় ফেলে রেখে আসবে। আশা করা যায়, এতেই তার মাথা ঠিক হয়ে যাবে।'

০

কতকক্ষণ তার জ্ঞান ছিল বলতে পারে না সে। সন্ধ্যার সময় অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ওপরের কামরায় রেখে আসা হলো। যখন তার জ্ঞান ফিরলো, দেখলো সে লাশের পাশে পড়ে আছে। এক কোণায় সামান্য পানি ও কিছু খাবার রাখা। সে খাবার খেলো এবং পানি পান করলো। তারপর লাশের দিকে

ফিরে বললো, 'আমি তোমার সাথ গাদ্দারী করবো না বন্ধু! আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসছি।' কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে গেল সে।

মাঝ রাতে তাকে আবার জাগানো হলো এবং তাকে নিয়ে গিয়ে চাকার সাথে বেঁধে দেয়া হলো। সুদানী সেনাপতি দাঁড়িয়েছিল টেবিলের পাশে। বললো, 'হাজার হাজার মুসলমান আমাদের সাথে আছে। হয়ত তুমি পাগল হয়ে গেছ, নইলে এমন মোহনীয় প্রস্তাব পায়ে ঠেলতে না। তুমি ভাবছো, তুমি ইসলামের জন্য জীবন কোরবানী দিচ্ছো। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তার বাদশাহী কায়েম করতে তোমাদের মত পাগলদের হত্যা করাচ্ছে। আর সে হতভাগা নিজে মদ ও মেয়ে নিয়ে পড়ে আছে। হুর গেলমান দিয়ে ভরা তার হেরেম। আর তোমরা এমনই হতভাগা, তার জন্য জীবন দিয়ে ভাবছো ইসলামের মহা খেদমত করে চলেছো।'

'ওরে পাপিষ্ঠ সেনাপতি!' ইসহাক বললো, 'আমি তোমাকে আমাদের আমীর ও সুলতানের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করতে বাঁধা দিতে পারছি না। কিন্তু তুমিও আমাকে তার আনুগত্য ও আমার ঈমানের পথে অটল থাকতে বাঁধা দিতে পারবে না। আমার গোত্রের কোন মুসলমানও তোমাদের সেনা দলে ভর্তি হবে না।'

'তুমি হয়তো জান না, আরবে মুসলমানরা-মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। রক্ত প্রবাহিত করছে একে অন্যের।' সুদানী সেনাপতি বললো, 'আর খৃস্টানরা ফিলিস্তিনে বসে

তামাশা দেখছে। সমস্ত আমীর ও মুসলিম শাসকরা সম্মিলিতভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।'

'তারা হয়তো দুনিয়ার মোহে তোমাদের মত ফেরেববাজদের পাল্লায় পড়ে গেছে, আমি তা করবো না।' ইসহাক আরো বললো, 'যারা বিদ্রোহ করেছে তারা এ দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে। পরকালে তো অসীম শাস্তি রয়েই গেছে। তুমি অযথা আমার পেছনে সময় নষ্ট করছো। আমাকে যে শাস্তি দেয়ার দাও, যা খুশী ব্যবহার করার করো, কিন্তু তোমাদের আশা আমাকে দিয়ে পূরণ হবে না।'

'দেখো, কেনো গোয়ার্তুমী করছো? তোমার একটু ইশারা পেলে তোমার গোত্রের সব মুসলমান আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।' সেনাপতি বললো, 'আর আমরা তো এ কাজ বিনা মূল্যে করাতে চাই না। আমরা তোমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবো।'

'আমার ভাগ্য পরিবর্তন করার কোন সাধ্য তোমাদের নেই। মিথ্যা বাহাদুরী ছাড়ো। আমি শেষ বারের মত বলে দিচ্ছি, আমি আমার জাতি ও ধর্মের সাথে গাদ্দারী করবো না।' ইসহাক বললো।

তাকে চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। হাত চাকার সাথে বাঁধা। চারজন হাবশী দাঁড়িয়ে ছিল চাকা বাঁধা লম্বা খুঁটির পাশে। সুদানী সেনাপতি সেদিকে তাকিয়ে তাদেরকে চাকা ঘুরানোর জন্য ইশারা করলো। হাবশীরা এক পাক ঘুরিয়ে দিল চাকা। চাকা ঘুরানোর ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজের সাথে বাড়তে লাগল

শরীরের ওপর টান। ইসহাকের মনে হলো, কাঁধ থেকে বাহু খসে যাচ্ছে। পা পৃথক হয়ে যাচ্ছে উরু থেকে। তার শরীর দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। এমন ঘাম বেরোচ্ছিল শরীর থেকে. মনে হচ্ছিল কেউ তার গায়ে পানি ঢেলে দিয়েছে।

'এখনও চিন্তা করো কি করবে?' তার কানে সুদানী সেনাপতির শব্দ ভেসে গেল।

'না, কিছুতেই ঈমান বিক্রি করবো না।' ইসহাক দাঁত কামড়ে কাতরাতে কাতরাতে বললো।

চাকা আরও একটু ঘোরানো হলো, তার শরীরের চামড়া ফেটে যেতে লাগলো।

'এখন আশা করি সুবুদ্ধি আসবে।'

'আমার লাশও এই একই কথা বলবে।' ইসহাক অতি কষ্টে উচ্চারণ করলো।

'একে কিছুক্ষণ এভাবেই থাকতে দাও। ও মানবে না, ওর বাপ মানবে। বেয়াড়া ঘোড়া কি করে বাগে আনতে হয়, আমি জানি।' সেনাপতি বললো।

ইসহাক চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কোরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলো। সেনাপতি চলে গেল।

ইসহাকের শরীরের সমস্ত জোড়া যেন খুলে যাচ্ছিল। ছিঁড়ে যাচ্ছিল চামড়া।

তার মুখ উপরের দিকে। চোখ খুললো ইসহাক। তার মনে হলো, সে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। সে বলতে লাগলো,

'হে ইহ ও পরকালের প্রভু! আমি তোমার অপরাধী এক বান্দা। আমাকে পাপমুক্ত করার জন্য আমাকে আরো বেশী করে শাস্তি দাও। তোমারই মেহেরবানীতে আমি এখনও তোমার সঠিক পথে টিকে আছি। তুমি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে শাস্তি দাও, কিন্তু তোমার পথে টিকে থাকার নেয়ামত থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।' ইসহাক আবার চোখ বন্ধ করে কোরআন তেলাওয়াত করতে লাগলো।

'তুমি চিৎকার করছো না কেন?' ইসহাকের পাশে দাঁড়ানো প্রহরী বললো, 'খুব জোরে জোরে চিৎকার করো, তাতে কষ্ট ও বেদনা কিছুটা লাঘব হয়।'

'কই, আমি তো এখন আর কোন কষ্ট পাচ্ছি না।' ইসহাক বললো, 'তোমরা যত খুশী নির্যাতন চালাও, আমার আর কষ্ট হবে না। আমার প্রভু আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তিনি তো আগুনের কুণ্ডলীকেও ফুলের বাগানে পরিণত করতে পারেন। কষ্টকে সুখে পরিণত করে দেয়ার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। তাইতো মুমীন কোন নির্যাতনকেই ভয় পায় না। তোমাদের প্রতিটি নির্যাতনে আমি এখন তৃপ্তিকর সুখ পাবো। তোমরা যত বেশী অত্যাচার করবে তত দ্রুত আমি আমার মালিকের দিকে এগিয়ে যাবো।'

কয়েদখানার জল্লাদরা পশুর মতই হিংস্র হয়। এক জল্লাদ হাবশী প্রহরীদের বললো, 'আরও চাকা ঘোরাও।'

হাবশীরা আরো একটু চাকা ঘুরালো। ইসহাকের দেহ থেকে বাহু আলাদা হওয়ার শব্দ হলো মট করে। দরজায় দাঁড়ানো

সিপাহী দৌড়ে এসে বললো, 'কি করছো তোমরা! এ তো মারা যাবে! জলদি চাকা নিচু করো'। একে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। জলদি চাকা নামাও।'

'এ লোক বলছে তার কোন কষ্ট হচ্ছে না।' জল্লাদ বললো।

'তার কি কোন জ্ঞান আছে? তোমরা যে পরিমাণ চাকা ঘুরিয়েছো তাতে মানুষ মারা যায়। এ লোক তো বেহুশে কথা বলছে।'

'আমি স্বজ্ঞানেই আছি বন্ধু!' ইসহাক দুর্বল স্বরে বললো, 'আমি আমার আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছি।'

দুই সিপাই একে অন্যের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকালো। একজন বললো, 'দেখে তো একে তেমন শক্তিশালী মনে হয় না। এ অবস্থায় মহিষের মত হাবশীও বেহুশ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এ কোন বড় দরবেশ হবে। নিশ্চয়ই তার কাছে আল্লাহর গায়েবী শক্তি আছে।'

'হ্যাঁ! তুমি ঠিকই বলেছো।' ইসহাক বললো, 'আমার কাছে আল্লাহর শক্তি আছে। আমি আল্লাহর কালাম পড়ছি। এ কালামের জোর চাকার চাইতে অনেক বেশী। তোমরা চাকা আরও জোরে ঘুরিয়ে দেখো, আমার দেহ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, তবুও তোমরা এই একই সুর শুনতে পাবে।'

এ সৈনিক ও প্রহরীরা ছিল নিরক্ষর ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ব্যক্তি পূজা ও শক্তি পূজায় মত্ত থাকতো ওরা। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পীর-ফকির ও দরবেশদেরকে তারা খোদার মতই শক্তিমান মনে করতো।

তারা ভাল মতই জানতো, এ চাকায় বাঁধা মানুষ চাকার সামান্য নড়াচড়াতেই চিৎকার দিয়ে বাড়ী মাথায় করে তোলে। তখন তাদের যা বলা হয় তাই মেনে নেয়। চাপ সামান্য বেশী হলেই বেহুশ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মারাও যায়। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রচণ্ড চাপ সহ্য করেও বেঁচে আছে! স্বজ্ঞানে আছে! সিপাইরা বুঝতে পারলো, এ ব্যক্তি কোন সাধারণ লোক নয়। নিশ্চয়ই সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

'তুমি আকাশের খবর জানো?' এক সিপাই প্রশ্ন বললো।

'হ্যাঁ, আমার খোদা জানেন।' ইসহাক উত্তর দিল।

'তোমার খোদা কোথায়?'

'আমার মনের মধ্যে!' ইসহাক উত্তর দিল।

'আমরা গরীব মানুষ!' এক সিপাই বললো, 'এখানে তোমার মত লোকদের হাড্ডি গুঁড়ো করে বালবাচ্চাদের জীবন বাঁচাই। তুমি কি আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারো?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে বের হতে পারলে পারি!' ইসহাক বললো, 'আমি যা পড়ছিলাম, তোমাদেরকে তা বুঝিয়ে দেব। তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে।'

'আমরা চাকা নিচু করছি।' এক সিপাই বললো, 'সেনাপতিকে আসতে দেখলে চাকা উপরে তুলে দেবো।'

'না!' ইসহাক বললো, 'তোমাদের এমন ছলচাতুরী আমার পছন্দ নয়। এ ধরনের প্রতারণা আমার ঈমান বিরোধী!'

'কিন্তু আমরা যে তোমাকে সাহায্য করতে চাই।' এক সিপাই বললো, 'আপনি যখন যা বলবেন, আমরা তাই করবো। যদি

সম্ভব হয় তবে আপনাকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দেবো।'

o

সেনাপতি এসে পড়লো।

'কেমন লাগছে? স্বজ্ঞানে আছ তো?' কৌতুকের স্বরে ইসহাককে জিজ্ঞেস করলো সেনাপতি।

'আমার আল্লাহ্ আমাকে এখনও বেহুশ করাননি।' ইসহাক উত্তর দিলো।

সেনাপতির ইশারায় চাকা ঘুরাতে লাগলো হাবশী সৈনিকরা। ইসহাক স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার দেহ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার জীন্দেগীর সফর শেষ হয়ে আসছে। সে কাতর স্বরে যতদূর সম্ভব জোরে আল্লাহর কালাম পাঠ করতে লাগলো। চাকা আরও ঘুরানো হলো। তার শরীর থেকে এমন শব্দ হতে লাগলো, যেন জোড়া খুলে যাচ্ছে।'

'তুমি মনে করো না, আমরা তোমাকে জানে মেরে ফেলবো।' সুদানী সেনাপতি বললো, 'তুমি বেঁচে থাকবে আর তোমার সাথে প্রতিদিন এমন ব্যবহার করা হবে। আমরা তোমাকে মেরে ফেলে কষ্ট থেকে মুক্ত করবো না।'

ইসহাক কোন উত্তর দিলো না, আপন মনে কোরআন পাঠ করতে থাকলো।

সেনাপতির নির্দেশে চাকা নিচু করা হলো। সেনাপতির সাথে আরেকজন অফিসার এসেছিল, সেনাপতি তাকে বললো, 'বড় কঠিনপ্রাণ মনে হচ্ছে। এত কিছু করেও তাকে বেহুশই করা

গেল না। আমরা যদি এরচে বেশী চাপ দেই, তবে সে মারা যাবে। কিন্তু তাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

'আমি আরেকটি বিষয় চিন্তা করেছি।' বললো সে অফিসার, 'আমি শুনেছি, তার চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আছে। তার বিবিও আছে। এ দু'জনকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে আসুন।'

'না, ওই এলাকা থেকে ওদের বের করা যাবে না। ওখানে কোন সুদানী সৈন্য গেলে সে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।' বললো সেনাপতি।

'ইসহাক কারাগারে আছে, তার অবস্থা মরণাপন্ন। মরার আগে সে তোমাদের একবার দেখতে চায়। তার আবেদনে সদয় হয়ে সরকার তোমাদেরকে তার সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে।' আমাদের কোন দূত তাদেরকে এ কথা বলতে পারে। সে যাবে সাধারণ নাগরিকের বেশে, সৈনিকের পোশাক পরে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমার বিশ্বাস, এ কথা শুনলে ওরা না এসে পারবে না।'

'হ্যাঁ! এটা ভাল বলেছো। তাদের ধোঁকা দিয়ে এভাবে ডাকলে ওরা আসতে পারে। ওখানকার মুসলমানরা আমাদের কোন সৈন্যকে তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না দিলেও, দূতকে হয়তো আটকাবে না।'

'তার বউ ও বেটিকে ডেকে এনে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দেব তার সামনে।' অফিসার বললো, 'তারপর বলবো, আমাদের শর্ত মেনে নাও নইলে তোমার সামনেই তোমার স্ত্রী ও

কিশোরী কন্যার ইজ্জত লুট করা হবে।'

কামরার সিপাইরা সেনাপতি ও অফিসারের কথোপকথন শুনছিল। সেনাপতি তাদের একজনকে ডাকলো। বললো, 'তোমাদের কমান্ডারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

একটু পর কমান্ডার এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল সেনাপতির সামনে। সেনাপতি কমান্ডারকে বললো, 'তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠাচ্ছি। আমার কথা মন দিয়ে শোন। এ অভিযানে তোমাকে সফল হতেই হবে।'

তারপর তাকে ইসহাকের গ্রামের ঠিকানা ও যাওয়ার রাস্তা ভালমত বুঝিয়ে দিল। কেন তাকে পাঠানো হচ্ছে তাও বুঝিয়ে বললো। তাকে বলা হলো, 'অবশ্যই তুমি মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলবে। তুমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর খুব প্রশংসা করবে। এভাবে কার্যোদ্ধার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে তুমি।'

কমান্ডার তখনি যাত্রা করলো ইসহাকের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ইসহাককে চাকার মেশিন থেকে নামিয়ে সেই কামরায় ফেলে রাখা হলো, যেখানে এক মিশরীর লাশ পঁচে গলে পড়েছিল।

ইসহাক আর উঠে বসতে পারছিল না। শরীরের মাংশপেশী যেন ছিঁড়ে গেছে তার। জোড়াগুলো আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু সে আল্লাহর ধ্যানে এমনি নিমগ্ন হয়ে রইলো যে, কোন ব্যথা বেদনার অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারলো না। আল্লাহর স্মরণ তার শারীরিক ব্যথা বেদনা ভুলিয়ে দিলো। কিন্তু সে

জানতো না, তাকে এমন মানসিক যাতনা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যাতে তার অন্তরাত্মা বেদনায় ছটফট করে উঠবে,। তারই চোখের সামনে তার মেয়ে ও বিবিকে এনে নির্যাতন করবে।

সেই কয়েদখানা থেকে তার গ্রাম ছিল অনেক দূর, আর পার্বত্য পথও ছিল দুর্গম। অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে সে অঞ্চলে ছুটলো কমাণ্ডার। সারাদিন আর সারা রাত বিরতিহীন ঘোড়া ছুটিয়ে ভোরে গিয়ে পৌঁছলো সেই দুর্গম অঞ্চলে।

এইমাত্র সকাল হয়েছে। পূর্বাকাশ ফর্সা করে উঠতে শুরু করেছে রক্তিম সূর্য। কমাণ্ডার নির্দিষ্ট বাড়ী খুঁজে বের করার আগে একটু জিরিয়ে নিতে চাইল। বাগানের পাশে এক বৃক্ষের সাথে ঘোড়া বেঁধে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সে।

সুদানী সেনাপতি ও অফিসার বেরিয়ে গিয়েছিল কারাগার থেকে। ডিউটি বদলের সময় হয়ে এলো সৈনিক ও প্রহরীদের। একটুপর ডিউটিতে আসবে অন্য সৈনিক। কারাকক্ষের সিপাইরা পরামর্শে বসলো। তাদের চোখে ইসহাক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দরবেশ। একে কষ্ট দিলে তাদের ভাগ্যে কি দুর্ভোগ নেমে আসে সে চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়লো। তারা আরো পেরেশান হয়ে গেল এই ভেবে, দু'এক দিনের মধ্যেই তার বিবি ও কন্যাকে কারাগারে ডেকে এনে অপমান করবে। এটা মেনে নেয়া ও সহ্য করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। খোদার একজন দরবেশের পর্দানশীন সম্মানিতা স্ত্রী ও কন্যার ওপর যদি কোনরূপ নির্যাতন চালানো হয়, যদি তাদের সম্ভ্রমের হানি ঘটে, তবে এ জন্য উপস্থিত সবার ওপরই আল্লাহর গজব

নেমে আসবে।
এক সিপাই বললো, 'তিনি তো বলেছেন, তিনি বের হতে পারলেই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবেন! আমরা তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করি না কেন?'
'কিন্তু কিভাবে তাকে মুক্ত করবো?'
বহু আলোচনা করেও তাকে মুক্ত করার কোন যুৎসই বুদ্ধি ওরা বের করতে পারলো না। শেষে সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করলো, 'আমরা এ দরবেশকে মুক্ত করতে না পারলেও তার স্ত্রী-কন্যাকে কিছুতেই এখান পর্যন্ত আনতে দেবো না।'

০

বিশ্রাম শেষে সুদানী কমান্ডার আবার ঘোড়ায় চেপে বসলো। একটু এগুতেই একদল লোকের সাথে দেখা হলো তার। সে ওদের জিজ্ঞেস করলো, 'ইসহাক নামের কাউকে চেনেন? মস্তবড় যোদ্ধা। এ পাহাড়ী অঞ্চলেই কোন গ্রামে তার বাড়ী। তিনি মিশরের সেনাবাহিনীর একজন বড় অফিসার।'
সে অঞ্চলে ইসহাকের খুব নাম-ডাক ছিল। তাকে সবাই চিনতো। ওরা বললো, 'কেন? তার বাড়ী খুঁজছেন কেন আপনি? তিনি কোথায়? কেমন আছেন?'
ওদের প্রশ্নে উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল। কমান্ডার বললো, 'তিনি আহত অবস্থায় যুদ্ধবন্দী হয়ে ধরা পড়েন সুদানী বাহিনীর হাতে। এখন সুদানের কারাগারে আছেন। তার অবস্থা খুবই খারাপ! তিনি তার স্ত্রী ও কন্যার সাথে দেখা করার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ

করেছেন। আমি তাদের দু'জনকে নিতেই এখানে এসেছি।'
লোকগুলো এ খবরে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারা একজনকে তার সাথে দিল ইসহাকের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। পাহাড়ী প্রান্তর দিয়ে কিছু দূর এগিয়েই তারা ইসহাকের গ্রামে গিয়ে পৌছলো।
ইসহাকের বাড়ীতে উপস্থিত হতেই তার বৃদ্ধ পিতার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। সুদানী কমান্ডার ঝুঁকে করমর্দন করে খুব মার্জিত ভাষায় বিনয়ের সাথে বললো, 'আপনার পুত্র এমন বীর, আমাদের সেনাপতিও তাকে ঝুঁকে সালাম করে। সে খুব বীরত্বের সাথেই যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু মরুভূমিতে কয়েক দিন পানির অভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শেষে আহত হয়ে বন্দী হয়ে যায়। তার চিকিৎসা চলছে। সুদানের সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করছে। কিন্তু তাতেও তার অবস্থার তেমন উন্নতি হচ্ছে না। এত ভাল চিকিৎসার পরও তার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সেনাপতি তাকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন ডাক্তারদের। চিকিৎসকরা তাকে নিয়ে শংকিত। এ অবস্থায় তিনি তার কন্যা ও বিবিকে শেষ বারের মত দেখতে চেয়েছেন। সেনাপতি আমাকে বলেছেন, 'তুমি জলদি ওর গ্রামে যাও। দ্রুত ওর বিবি-বাচ্চা নিয়ে ফিরে আসবে।'
'তোমরা যদি তাকে এতই সম্মান করো, তবে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছ না কেন?' ইসহাকের বাবা বললেন, 'আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকই তার সবচে ভাল চিকিৎসা

করতে পারবে।'

'সুদানের সরকার বলেছে, তিনি আমাদের মেহমান!' কমান্ডার উত্তর দিল, 'মেহমানকে অসুস্থ অবস্থায় বিদায় করা মেজবানের জন্য অসম্মানজনক। আর এ অবস্থায় তিনি সফরও করতে পারবেন না। তাতে তার আরও ক্ষতি হবে। আমি আশা করি, সুস্থ হলে তাকে সুদান সরকার সম্মানের সাথেই বিদায় দেবে।'

'আমার ছেলে বাড়ী নেই। তার স্ত্রী-কন্যা এখন আমার হেফাজতে। আমি বুড়ো মানুষ, সফর করতে পারবো না। ওদেরকে আমি এখন কার সাথে পাঠাই? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি বউমার সাথে বুঝে আসি।'

'আপনি ওদের বলবেন, কন্যা ও স্ত্রীকে কাছে পেলে এবং তাদের সেবাযত্ন পেলে তিনি হয়তো জলদি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'কিন্তু ওখানে ওরা কোথায় উঠবে? কিভাবে থাকবে?'

'এরা সেখানে গেলে সুদান সরকারই তাদের সম্মানের সাথে থাকার ব্যবস্থা করবেন।' কমান্ডার বললো, 'আমাদের ওখানে বীরদের খুব সম্মান করা হয়। আমাদের ধর্ম যদিও পৃথক, কিন্তু আপনারা ও আমরা এক জাতি, সুদানী। আমরা দেশের ও মাটির সম্মান করি। যদিও ইসহাক সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমান্ডার, তাতে কোন পার্থক্য নেই, আমরা স্বদেশী ভাই। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আমরা খুব বড় যোদ্ধা ও বীর হিসেবে মান্য করি। তিনি খৃস্টানদেরকে একদম হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়েছেন।'

'তবে তোমরা আইয়ুবীকে শত্রু মনে করো কেন?'

'সম্মানিত মুরুব্বী!' কমান্ডার বললো, 'এভাবে কথায় সময় নষ্ট করা আমার ঠিক হচ্ছে না। রাজনৈতিক আলোচনা একবার শুরু হলে তা আর শেষ হতে চায় না। আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দিন। আপনার পুত্র বধু ও নাতনীকে দ্রুত আপনার পুত্রের কাছে পৌঁছানো দরকার। আপনার পুত্রের ইচ্ছা পূরণ করাই এখন আমার সবচে বড় জিম্মাদারী। আপনার নাতনী ও পুত্র বধু এখন আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছে কিনা একটু দেখে আসুন।'

পর্দার পিছন থেকে নারী কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো, 'হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।'

'কোন পুরুষ কি সাথে যাবে না!' বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো, 'আমিও কি যাবো তোমাদের সাথে?'

'আব্বা, রাস্তা অনেক দূর! আপনি এত দীর্ঘ পথ ঘোড়ার পিঠে বসে সফর করতে পারবেন না। এ ধকল সহ্য হবে না আপনার। তারচে আমরা মা-মেয়ে দু'জনই যাই।'

কারাগারের সিপাইরা ডিউটি শেষে বাড়ীতে ফিরে গেল। প্রতিজ্ঞা মত এক সিপাই তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে, কাপড় দিয়ে মুখ ও মাথা ভাল করে ঢেকে, ঘোড়ার জন্য কিছু ঘাস ও পানি সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর কাউক কিছু না বলেই বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। তারপর তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কমাণ্ডারের পথ ধরে।

ইসহাকের বাড়ীর ঠিকানা সে ভালমতই মুখস্ত করে নিয়েছিল।

সেনাপতি যখন কমান্ডারকে রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তখন এ সিপাই পাশে দাঁড়িয়ে তা খুব মনযোগের সাথেই শুনেছিল। তার মনে একটা বিশ্বাস ছিল, সে পথ ভুল করবে না।

কমান্ডার তার অনেক আগেই রওনা দিয়েছিল। সে কারণে কমান্ডারের আগেই ইসহাকের বাড়ী পৌছে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার ইচ্ছে, বাড়ী থেকে বের হওয়ার আগেই তাদের বাঁধা দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ফিরতি পথে ওদের আটকাতে হবে। ফলে প্রাণপণে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৫

উমরু দরবেশ

ক্রুসেড-১৪
তুমুল লড়াই
আসাদ বিন হাফিজ